এবং কয়েকজন যুবক

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য

মনুদি এবং ইব্রাহিম খানের আন্তরিক উৎসাহ না পেলে হয়তো কোনদিন এই দ্বিজত্ব ও পতনের কাহিনী লেখা হত না।

রচনাকাল ও মুদ্রণ সময় ঃ
১৯৬৫ মে।
....
প্রকাশক ঃ শৈলেন্দ্রনাথ বসু
৬৮, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯
....
মুদ্রাকর ঃ বি. এন. ঘোষ
আইডিয়াল প্রেস
১২।১, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬।
বাঁধাই ঃ
নিউ সেণ্ট্রাল বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস।
....

নামক একটি স্বাতন্ত্র্যবোধে স্বীকৃত
ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার প্রথম
সংস্করণের লভ্যাংশ সম্পূর্ণ প্রাপ্য।

....

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ
সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য

এবং কয়েকজন যুবক

কণারক প্রকাশন
৬৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতাঃ নয়।

উৎসর্গ

আমার প্রিয় কুকুর ইয়ং-কে

এই কাহিনীর চরিত্রগুলি বর্তমান সমাজ থেকে টুকরো টুকরো বাস্তব উপাদান সংগ্রহ করে জোড়া তালি লাগিয়ে এবং তার সাথে নিজের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কল্পনা মিশিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। শ্লীল-অশ্লীল বুঝি না, বুঝি বর্তমান কালের তথাকথিত শিক্ষিত যুবকদের চেহারা। বলি, স্বচ্ছ আত্মার-দর্পণে একবার চোখ রাখ। নিজেকে চিনতে পারলেই সমাজের মংগল। এবার বইটি পড়ুন।

'অতীশ' ছদ্মনামের আড়ালে এর শুরু করেছিলাম দেয়াল নামক পত্রিকায়, পরে দেখলাম জীবন স্বয়ংস্বচ্ছ এবং স্বাভাবিক ব্যাপার, অতএব প্রয়োজন নেই, বলে সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য স্বনামেই এই গ্রন্থের প্রকাশ হলো।

মুদ্রণ ত্রুটি আছে উনপঞ্চাশ পাতায়, সেখানে অমল নামের পরিবর্তে শ্যামল নাম হবে।

এবং
কয়েকজন
যুবক

অতীশ ভট্টাচার্য

এক

নিরুপম মাত্র অরুণার হাতটা ধরে টান দিয়ে কাছে আনবার চেষ্টা করছিল, সে সময় ভেজানো দরজা শব্দ করে খুলে অমল প্রবেশ করল।

একটা টিকটিকি দরজার পেছন থেকে আচম্কা পড়ে গিয়ে কয়েক মিনিট স্তব্ধ হয়ে আবার দ্রুত দেওয়ালে উঠে পড়ল।

অমল টিকটিকির দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টি রেখে হাসল।

অবশেষে অমল বললে—ভাগ্যিস টিকটিকিটা ছিল।

অরুণা পালাল।

নিরুপমের এই ঘরে দুটো দরজা। একটা দিয়ে অন্দরে যাওয়া যায় অপরটি বাইরে।

নিরুপম অসহায় কণ্ঠে ডাকল—শোন অরুণা, যেও না।

অরুণা শুনল না। আটপৌরে ডোরাকাটা শাড়ির আঁচল বুকে ঠিক করতে করতে অমলের পাশ দিয়ে চলে গেল। অমল অরুণার চুলে গন্ধ-তেলের সুগন্ধ পেল। কয়েক দিন আগে নিরুপমের হাতে কেশরঞ্জনের নতুন শিশি অমল দেখেছিল বাজার থেকে কিনে আনতে। বোধহয় ভালবাসার বিনিময়।

অমল আরও একটা কথা বললে—যাঃ প্রজাপতি পালিয়ে গেল। আজকাল কিন্তু অরুণাকে নিয়ে বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করছিস।

'অপদার্থ' কথাটার উপর জোর দিয়ে উচ্চারণ করে নিরুপম মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল।

অমল চেয়ারটা টানতে গিয়ে একটু ঝুঁকল। চেয়ার টেনে এনে নিরুপমের তক্তপোশের কাছে বসল। বাঁ হাতটা পকেটে ঢুকিয়ে পানামার প্যাকেটটা বের করে আনে। সেখান থেকে দুটো সিগারেট বের করে নিরুপমকে একটা দেয়। নিরুপম মুখটা ঘুরিয়ে রেখেই হাত পেতে পানামা নেয়। অগত্যা অমলের কাছে দেশলাই না থাকায় বালিশের নিচ থেকে দেশলাই বের করে দুই ঠোটের ডানধারে লাগানো পানামার কাছে নেয়। ফস্ করে দেশালাইয়ের একটি কোনায় ঘসে একবারেই পানামা ধরায় এবং কাঠির আলোটা অমলের মুখের কাছে নিয়ে যায়।

নিরুপম একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বললে—কি রে, আলোর খবর কি? কি বলছে আজকাল?

ঃ কিছুই বুঝতে পারছি না। এতদিন ঘুরলাম তবু ওর মনের কথা বুঝতেই পারছি না। ও যে কি চায় আর কি যে চায় না একবার যদি আমায় বলত—অমল গলার স্বরটা ক্রমে ক্রমে নিচ-খাদে নামিয়ে এনে বললে।

ঃ শশাঙ্ক বাবুর মেয়ে এখন কি করছে জানিস?—নিরুপম অন্য প্রসঙ্গ তুললো।

ঃ শুনলাম পালিয়ে গেছিল—অমল মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে এনে বললে।

ঃ কি বলছিস? কার সাথে?—নিরুপম অবাক হতে গিয়ে কাশল। সিগারেটের ছাই ছাই-দানীতে ঝাড়ল।

ঃ বলতে পারছি না। তবে আমি ওর বারোটা বাজিয়ে দিয়েছি

এর আগেই—ছাদের সিলিং-এ চোখ রেখে ধুয়োর রিং করতে [illegible]তে বললে।

ঃ মেয়েটি কিন্তু পড়াশোনায় ভাল ছিল—নিরুপম বালিশটা বুকের কাছে নিয়ে এল।

ঃ ভালতো নিশ্চয়ই ছিল। একটু বুঝিয়ে দিলেই চট্ করে সমস্ত ব্যাপারটা ধরে নিতে পারত। নাইন থেকে টেনে উঠতে অঙ্কে সত্তর পেয়েছে। ওর বাবাতো তাই দেখে দশটাকা মাইনে বাড়িয়ে দিল আমাকে—পর পর ছুটো ধুয়োর রিং অমল উপর দিকে ছেড়ে দিল।

ঃ ওর বাবা কি করলেন? কাকে সন্দেহ কবছে?—নিরুপমের চোখের ভ্রূ সামান্য কুঁচকে গেল।

ঃ কি আর করবে? নিরুদ্দেশ হয়েছে বলে থানা পুলিশ ডাইরী। তবে আমাকে সন্দেহ করে নি। আমাকে ওরা ভালবাসত—স্বাভাবিক ভাবে অমল বললে—আব তাছাড়া একবছর হল ওদের বাড়ি আমি আর যাই নি।

ঃ ছেলেটার খোঁজ পেয়েছে?—নিরুপম এবার উঠে বসল শোওয়া অবস্থা থেকে।

ঃ না। তবে—

ঃ তবে কি?

ঃ সাতদিন পর পূর্ণিমা ফিবে এসেছে। আর সেদিনই আমি পূর্ণিমার খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম ব্যাপারটা সত্যি কিনা জানতে। স্কুলফাইন্যাল পাশ করিয়ে দিয়ে সেই যে ছেড়েছি আর যাই নি। কলেজে ঢুকেই পূর্ণিমা এ কাণ্ড করে বসল। যাক্, দেখলাম পূর্ণিমার সেই শ্বেত শঙ্খের মত কোমল মুখ শুকিয়ে আমসী। বুড়ি বুড়ি চোখছুটো বসে গেছে। চোখের চারধারে অস্পষ্ট কাল ছাপ। কাগাবগা চুলগুলো। ওর সাথে কোন কথা না বলে চলে আসি। তাছাড়া সে সময় থাকাটা আমার উচিত হত না, পরে শুনলাম।

নিরুপম অমলের কথাটা কেড়ে নিয়ে আবার বললে—কি শুনলি ?

—শুনলাম ওর ছেলে হবে।

অমল সিগারেটে শেষ টান দিয়ে টুকরোটা ছাইদানীতে ফেলে দিল। নিরুপম আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল।

প্রথমে দরজার একটি কপাট আস্তে আস্তে খুলে পরেশ ঢুকল, তারপর মণ্টু। মণ্টু ফের দরজা বন্ধ করে দিল।

পরেশ ঘরে ঢুকেই বললে—আলো কে না পেলে আমি সত্যি মারা যাব নিরুপম। অমল তুই তো ওর বাড়িতে যাস্ শুনেছি, আমাকে একদিন নিয়ে যাবি ? আমি শালা এতদিন ওর সাথে কথা বল্লাম, তবুও একদিন বাড়ি যাওয়ার কথা তুললে না। মেয়েটার দেমাক দেখে হেসে বাঁচি নে।

পরেশ কথাগুলো এক নাগাড়ে শেষ করল। তারপর নিরুপমের কোমরে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। ডান হাতটা অমলের দিকে প্রসারিত করে পরেশ বললে--দে একটা পানামা।

: একটাই আছে, ভাত খাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে শুয়ে টানতে হবে—অমল বাঁ পকেটে হাত রেখে বললে।

: নিরুপম, চারমিনার বের কর—পরেশ বললো নিরুপমের পিঠে একটা মৃদু চাপড় মেরে। শঙ্খমার্কা গেঞ্জির কিছুটা অংশ কুঁচকে গেল।

: আমার এখানে আড্ডা মারবি, আবার আমারই খাবি। এবার থেকে পালা করে সিগারেট নিয়ে আসবি—নিরুপম উঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে বললে, কিন্তু উঠল না। কোমরটা চুলকোতে চুলকোতে অন্য পাশ হয়ে শুয়ে রইল।

মণ্টু এতক্ষণ কোন কথা বলছিল না। চুপ করে নিরুপমের তক্তপোশের এককোনে বসে একটি সিনেমা পত্রিকার পাতায় স্থির চোখ রেখেছিল।

হঠাৎ বলে উঠল—গেল গেল সমস্ত রসাতলে গেল। তোরা তো আলো আলো করছিস্। আরে বুদ্ধুর দল এটাও বুঝতে পারছিস না, চলন্ত আলো তোদের হৃদয়ের আলো-কে নিভন্ত করে দেবে। তখন তোরা অন্ধকারে হাবুডুবু খাবি। মরবি। বরং দেখ—মন্টু ওদেরকে সিনেমা পত্রিকার ছবি দেখাল।

পরেশ চিলের থাবায় পত্রিকাটা কেড়ে নিল। নিরুপম হাতের কব্জিতে ভর দিয়ে মাথাটা তুলে ছবিটার উপর চোখ রাখল। অমল চেয়ারটা কাছে টেনে নিয়ে মাথাটা গলিয়ে দিল। চেয়ারের পায়ের সাথে কি একটা ঠেকে শব্দ হল। মন্টু পত্রিকাটা দেখতে পেল না, দেখল তিনটি মাথা একত্রিত হয়ে কি যেন খুঁজছে। মন্টু ভাবল, সিনেমা পত্রিকার ছবির জন্য অবশ্যই সরকার পক্ষ থেকে একটা সেন্সর কমিটি গঠন করা উচিত।

হঠাৎ অমল পরেশের হাত থেকে পত্রিকাটা টেনে নিয়ে নিরুপমের ঘরের মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভ্রূদুটো ওপর দিকে তুলে বললে—আরে দূর এ আর কি? এর চেয়ে আলোর পোষাক দেখলে তোরা ত ভীরমী খেয়ে যাবি।

পরেশ তক্তাপোষে একটা চাপড় মেরে বললে—ঠিক বলেছিস। মেয়েটা কেন যে এত বিশ্রী ভাবে সাজে। আহা, মরি মরি মেনকা।

মন্টু বললে—স্রেফ আমাদের জন্য। আলোর রূপ এবং সাজ দেখলে লোভ সামলানো যায় না। আমাকে এবছরে পরীক্ষায় বসতে হবে, তা না হলে—

পরেশ বললে—তা না হলে কি করতি তুই, শালা বিজ্ঞানের ছাত্র। আমরাই সাহিত্যের ছাত্র হয়ে টলাতে পারছি নে। আর তুই তো এম এসসির জুয়েল।

অমল উত্তর দেয়—যা বলছি শোন। রাতে ভাল ঘুম হবে। যেদিন আলোর সাথে প্রথম দুপুরের শোতে সিনেমায় গেলাম,

সেদিনের রূপচর্চ্চা অথবা সজ্জা যাই বলিস্ না কেন, বর্ণনা করছি। আধগজি পাতলা কাপড়ের ডিপকাট ব্লাউজ। প্রয়োজনের বেশি আঁট করে পরেছে যার জন্য পেছনে টিপ বোতাম আঁটা থাকা সত্ত্বেও ফাঁক ছিল। ব্লাউজের রঙের সাথে কাঁচ কাঁচ শাড়ির রঙ। কপালের মধ্যিখানে পাউডার টিপ, রঙ শাড়ির মতোই। সাবান জলে ধোওয়া খোঁপা উপর দিকে তুলে বেঁধেছে। সেখান রজনীগন্ধা গোঁজা। ঠোঁটে আলতো করে রঙ লাগিয়েছে। সেদিন কি আর ধৈর্য্য ধরে সিনেমা দেখতে পেরেছি। ওর শরীরের স্পর্শ পেতেই গা'টা টনটনিয়ে ওঠে। শরীর তো নয় মাইরী, যেন মাখন।

পরেশ এতক্ষণ মন দিয়ে শুনছিল। হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে এবং আবার শুতে শুতে বললে—রাতে ভাল ঘুম হবে মানে, আজকের রাতটা আমার ইনসমেনিয়ায় কাটবে।

মণ্টু গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করল অমলকে—সেদিন তোর কত টাকা লাগল ?

অমল উত্তর দেয়—মোট খরচ হয়েছে সাড়ে দশটাকা ওকে ফল কিনে দিতে হল আবার। তানাহলে খরচ আর একটু কম হত।

পরেশ উপরের দিকে চোখ রেখে নাক দিয়ে একগাদা ধুয়ো ছেড়ে হঠাৎ তড়াক্ করে লাফ দিয়ে উঠে বসে বললে—আরে বাস্ ব্যস্। আর বলতে হবে না। নিরুপম আমার বুকে একবার হাত দিয়ে দেখ।

পরেশ নিরুপমের ডান হাতটা টেনে নিয়ে বুকে রাখল। নিরুপম বাঁ হাতটা ইচ্ছে করে অমলের বুকে রাখল।

পরেশ বললে—টের পাচ্ছিস কি রকম ধড়াস্ ধড়াস্ করছে। তবু অমলের ভাগ্য আলোর সাথে সিনেমায় গেছে। এমন কি ওর বাড়ীতেও গেছে। অথচ বাস ষ্টপেজে অথবা ষ্টেশনে দেখা হলে বলি—কেমন আছেন ? শুধু তাই নয়, বোকার মত বলে ফেলি—কোথায় যাচ্ছেন ?

মণ্টু বললে—আলো-কে তোর মত কবি, শুধু তাই নয়, সাংবাদিক, এখনও পটাতে পারল না। বড্ড অবাক ঠেক্‌ছে।

পরেশ উত্তর দেয়—সবুরে মেওয়া ফলে। আর তাছাড়া অমল-তো অধ্যাপক, ও পেরেছে ?

ঠিক তখন বাইরের দরজায় টোকা মারার শব্দ হল তিনটি। কিছুক্ষণ পর আরও কয়েকটি। নিরুপম মণ্টুকে উদ্দেশ্য করে বলে—দেখ ত কে ?

তক্তাপোশ থেকে বাইরের দরজা বেশি দূর নয়। মণ্টু বসে থাকা অবস্থাতেই একটা পা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে অনেকটা ঝুঁকে দরজার একটা কপাট খুলল। খোলা দরজায় নিরুপমের চোখ পড়তেই নিরুপম চেঁচিয়ে বলে উঠল—নির্মল যে। অনেকদিন পর। খবর কি ? হঠাৎ ঢাকুরিয়া অঞ্চলে।

প্রত্যেকে নির্মলের দিকে তাকাল। মণ্টু মেঝেয় থেকে অমলের ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া সিনেমার বইটা কুঁড়িয়ে নিয়ে নির্মলের দিকে একবার তাকিয়ে পাতা ওল্টানোয় মনোনিবেশ করল। অমল চেয়ারটা ছেড়ে নিরুপমের তক্তপোশের উপর উঠে বসল। একটা বালিশ কোলের উপর রেখে বললে নির্মলকে—বসুন।

বিলেতী পোষাক পরা নির্মল চেয়ারটায় বসে।

নিরুপম এবার উঠে বসেছে। লুঙ্গিটা ঠিক করে নিয়ে নাভির কিছু নিচে গিট দিল এবং গেঞ্জিটা টেনে লুঙ্গির নিচে নামিয়ে দিয়ে বাবু হয়ে বসল।

নিরুপম বললে—আমার বন্ধু নির্মল। গতবছর ডাক্তারি পাশ করে এম, বি, বি এস হয়েছে। ভবানীপুরে ডিসপেনসারি আছে। নির্মল শুদ্ধ করে দিয়ে বললে—ভবানীপুর নয়, কালিঘাটে।

নিরুপম বললে—ওই হল।

অমল গম্ভীর হয়ে বসল। বললে হাত জোড় করে—নমস্কার।

পরেশ এবং মণ্টু অবাক অবাক চোখে নির্মলকে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে দেখতে লাগল। প্রত্যেকেই কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। নির্মল হতবাক্ হয়ে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। ডান-হাতের আঙ্গুল দিয়ে বাঁ হাতের কনুই চুলকাতে থাকে। পরে রেয়ন প্যান্টের পকেটে হাত দিতে গিয়ে সামান্য উঠতে হল। পকেট থেকে উইলসের প্যাকেট বের করে এনে প্রত্যেককে সিগারেট দেয়।

নিরুপম সিগারেটে টান দিয়ে বললে—হঠাৎ এখানে কি মনে করে। মনে হচ্ছে কোথাও এসেছিলি।

নির্মল হাসতে হাসতে উত্তর দেয়—তোর এখানেই এলাম। নিরুপম বললে—সেই পূজোর সময় একবার এসেছিলি। এতদিন বাদে আমার কাছে বিনা প্রয়োজনে, কিরকম সন্দেহ হচ্ছেরে নির্মল।

নির্মল আমতা আমতা করে বলতে চেষ্টা করল—রায় বাগান লেনের শেষ মাথায় একটি নূতন বাড়ি হয়েছে। ওরা অবশ্য নতুন এসেছে।

পরেশ শেষ পর্য্যন্ত আর চুপ করে থাকতে পারল না। ধৈর্য্য থেকে চ্যুত হয়ে বলেই ফেললে—মানে আলোদের বাড়ি। বাহান্ন বাই এক রায় বাগান লেন। তাই না?

নির্মল বুঝতে পারল, এদের কাছে আলো শুধু পরিচিত নয়, আলোচ্য বিষয়ও বটে। নিপুণ নায়কের চাতুর্যের ভূমিকায় নির্মল বিস্ময়ের মত চোখ দুটো করে নিয়ে বললে—আপনি কি বলতে চাইছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

মণ্টু পত্রিকা থেকে মুখটা তুলে নির্মলের কথার জবাবে বললে—আপনি যেভাবে বাড়ীর নির্দেশ দিচ্ছেন, সেখানে আলো নামে এক ভদ্রমহিলা থাকে।

পরেশ মণ্টুর কথা শেষ করতে দিল না। ফস্ করে মুখস্থের মত বলে উঠল—ভদ্রমহিলা সুশ্রী, দীর্ঘাঙ্গী, বি, এ, পাঠরতা।

গৌরবর্ণা ও স্বাস্থ্যবতী। বোধহয় আলোর বাড়ির কথাই আপনি বলছেন।

মণ্টু বললে—শুধু তাই নয়। গৃহকর্ম্মে নিপুনা। কি রে অমল, তুইতো ওদের বাড়ি যাস্। বল্ না?

মণ্টু সিগারেটে শেষ টান দিয়ে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়ে আবার বললে—এ অঞ্চলের সুন্দরী শ্রেষ্ঠ।

অমল শুধরে বলে—শ্রেষ্ঠা।

নির্মল ওদের কথার ধরণ চট্ করে বুঝতে না পেরে বললে—না, না আলোটালোর বাড়িতে নয়। আমারই এক বন্ধুর বাড়ি। ঢাকুরিয়ায় মামার বাড়ি, দিল্লী থেকে এসেছে।

পরেশ বললে—মামার নাম?

নির্মল শুধু ফ্যাসাদে পড়ল নয়, মনে মনে বিরক্তি বোধ করল। ভাবল, নিরুপমের যে আবার এত বন্ধু জুটেছে তা জানলে হয়তো এখানে আসতো না।

নির্মল বললে—সুবিমল অথবা সুকোমল এরকম একটা নাম। আমার ঠিক মনে পড়ছে না। যাক্, আপনারা কে কি করেন—তা এখনও জানতে পারলাম না।

নিরুপম বললে—এর নাম অমল। বাংলার অধ্যাপক। ও পরেশ, পত্রিকা অফিসে কাজ করে, সাংবাদিক। গল্পকার এবং কবি হিসাবে নাম কিনতে সুরু করেছে। আর মণ্টু এম, এস সির ছাত্র।

অমল নিরুপমকে খানিক জড়িয়ে ধরে বললে—এই হচ্ছে আমাদের অকৃত্রিম কলেজের বন্ধু নিরুপম রায়। ওকে আমরা এখানেই এনেছি, পেয়িং গেষ্ট এবং—

নিরুপম নিরুৎসাহ দেখিয়ে বললে—আর বলতে হবে না। থাম্।

নির্মল নিরুপমের কথা শেষ না হতেই বললে—ওর কথা বেশি

বলতে হবে না। তাহলে মার কাছে মাসীর গল্প বলা হবে। ও আমার বাল্যবন্ধু। তুই কি এখনও সেই অফিসেই আছিস্।

নিরুপম গুপ্ত-নিশ্বাস ছেড়ে বললে—কি আর করবো, কেরাণীর ভাগ্য নিয়ে জন্মেছি।

অমল হাসতে হাসতে আবার বলে—কেরানিগিরিতে ওর মোটেই দুঃখ নেই। এদিকে বাড়িওয়ালার আত্মীয়া একজন তেইশ উত্তীর্ণ মেয়ের সাথে প্রস্তুতি পর্ব চলছে, নাম অরুণা।

নিরুপম নির্মলকে উদ্দেশ্য করে বললে—বুঝতেই পারছিস, আমাদের আড্ডার বৈশিষ্ট। আশাকরি তোর পূর্বের মন আছে।

নির্মল একটু আড়ষ্ট হয়ে বলে—সেতো দেখতেই পাচ্ছি। এরকম আড্ডায় পূর্বের মন কৃত্রিমতার আড়ালে ঘুমিয়ে থাকলেও জাগিয়ে তুলতে হবে বৈকি।

অমল তৎপর প্রশ্ন করল নির্মলকে—আপনিও বুঝি সাহিত্য-টাহিত্য একটু আধটু করেন।

নিরুপমই জবাব দেয়—স্কুলজীবনে অনেক কবিতা গল্প ভ্রমনকাহিনী লিখত। কি রে এখনও লিখিস ?

নির্মল হতাশার নিশ্বাস চেপে দিয়ে বলে উঠল—রুগীর ব্যস্ততায় কোনদিক দিয়ে যে দিনটা পালিয়ে যায় একটুও বুঝতে পারি না। এর উপর আবার লেখা ? আর নয়।

অমল নিজের হাত ঘড়িটা দেখে নিয়ে বললে—সাড়ে পাঁচটা বাজে প্রায়, আমি চলি।

অমল সটান হয়ে উঠল। পাঞ্জাবীর প্রান্তভাগটা টেনে ঠিক করল। লুটিয়ে পড়া কোঁচা তুলে নিয়ে সযত্ন প্রয়াসে বাঁ দিকের পকেটে ঢোকাতে চেষ্টা করছে। এমনি সময়ে পরেশ অমলের ডান হাতটায় হেঁচকা টান মেরে বসিয়ে দিয়ে বললে—যাচ্ছিস্ কোথায় ? বোস।

অমল নির্মলের পাশ দিয়ে মণ্টুকে ধাক্কা দিয়ে পরেশকে নিয়ে হুমরি খেয়ে পড়ল নিরুপমের উপর।

নিরুপম একটু বিরক্তি হয়েই বললে—কি করছিস্? এখনও ছেলেমানুষী গেল না।

অমল এবং পরেশ যেমন ভাবে পড়ল ঠিক ওরকমভাবেই কতক্ষণ থাকে। তখন নিরুপম অনন্যোপায় হয়ে বললে—নে ওঠ, আমি আলো নই।

মণ্টু উঠে গিয়ে একহাত অমলের বুকে এবং অপর হাত পরেশের বুকে রেখে বললে—আঃ কি কথাই শোনাল মাইরী।

মণ্টু চোখ বুজে রইল। নির্মল আলোর নামটা শোনামাত্র গম্ভীর হল। আলো-কে এসময় নির্মলের বিশ্রী মনে হল।

তড়াক্ করে লাফ দিয়ে অমল উঠল এবং নির্মলের পাশ দিয়ে দরজায় শব্দ করে বের হয়ে গেল।

ওরা চারজন খোলা দরজার দিকে কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে থাকে।

পরেশ ছোট্ট ঢোক গিলে বললে—অমলটা ওরকমই। একাই বাজার মাত্ করতে চায়। এই আলোই একদিন ওকে কাত করবে। আমি ভবিষ্যৎ বাণী করছি! বামুনের ছেলে কথা বিফলে যাবে না।

মণ্টু অসঙ্কোচে বলে ফেল্ল—অমল কি আর আলোর সাথে প্রেম করতে যায়? ও ঠিক তালে আছে। সুযোগ পেলেই—বুঝলি পরেশ।

এরকম নির্মম উক্তিতে নির্মল অস্বস্তি অনুভব করল। কিন্তু উঠল না।

নিরুপম আবৃত্তি করে—হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী। নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব—অতএব বুঝতেই পারছিস্ আমাদের জন্যই কবির এই সোৎসাহ।

পরের ছত্রে সুর দিয়ে প্রবেশ করল দীপক, সাথে অমল—ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভ জটিল বন্ধ।

ওরা চারজন দীপকের সাথে অমলকে দেখে অবাক হল।

নিরুপম জিজ্ঞেস করল—কি রে আবার ফিরে এলি।

উত্তর দিল দীপক—আলো অন্ধকারে ডুবেছে। এইমাত্র ওকে কলেজ স্কোয়ারে দেখে এলাম। দেখলাম আলোর সাথে এক ভদ্রলোক। নিখুঁত ভাবে দাড়ি কামানো। ঝক্ ঝকে আদ্দির পাঞ্জাবী বোধহয় ফিন্‌লে, আর ব্রেসলেট ধুতি। সে এক কল্পলোকের হাওয়া রে অমল। আঃ কি অপূর্ব সাজ আলোর, দেহের গোপন সুরে চোখে জ্বালা ধরায়।

অমল তক্তপোষে বসতে বসতে কপট হয়ে দীপককে বললে—আজকের দিনটাই মাটি হল। কি রকম মেয়ে? বললে, আপনি আসবেন, আমি বাড়ি থাকব। তুই কিছু বললি না, ওকে দেখেও।

দীপক উত্তর দেয়—আলো আমাকে পাত্তাই দেয় না। আমাকে দেখেই ভদ্রলোকের হাত ধরে হাঁটতে সুরু করে। বোধহয় বাস আসতে দেরি করছিল।

মণ্টু তৎপর জবাব দেয়—প্রেস্টিজ লুজ করিস্‌নে অমল।

দীপক বাকীটুকু বলে—মনে রাখিস, তুই একজন অধ্যাপক।

অমল বিরক্তি হয়ে বললে—আরে দূর। অধ্যাপকের নিকুচি করি। ছাত্র ছাত্রীদের কাছে অধ্যাপক। গম্ভীর সংযত মৃদুহাসি অল্পকথা। তোদের কাছে বন্ধু। চপল অট্টহাস্য প্রগলভ। আলোর কাছে ভদ্রলোক। নম্র বিনয়ী সামাজিক।

পরেশ বোধহয় টিপ্পনী কেটে বললে—পাওনাদারদের কাছে ছোটলোক। গতমাসে পাঁচ টাকা ধার নিয়েছিস। দিয়েছিস্ এ মাসে।

পরেশকে কথাটা ফিরিয়ে দিয়ে অমল বলে—ছোট লোক। তোর একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই, যেখানে সেখানে।

পরেশ নির্মলের দিকে তাকিয়ে চট্ করে অমলের দিকে মুখ নিয়ে বললে—ওঃ সরি।

নির্মল এবার অসহ্য বোধ করল।

রেয়নের প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বললে—চলি নিরুপম।

নিরুপম প্রশ্ন করে—এত তাড়াতাড়ি। কোথাও এনগেজড কি?

নির্মল বললে—ডিস্‌পেন্সারীতে বসতে হবে। রুগীরা হয়তো এতক্ষণ ভীড় জমিয়ে দিয়েছে।

নিরুপম বললে—রোববারেও রুগী। বিশ্রাম করিস কখন?

নির্মল হাসল। প্রত্যেককে উদ্দেশ্য করে বললে—চলি। নমস্কার।

গড়িয়ে আসা মাতলামোর রূপায়নে নির্মল নিজেকে উপলব্ধি করল। আলো সম্পর্কিত কদর্য ভাষণের জন্য ঈষৎ অভদ্র এই যুবকগুলোকে খুব একটা খারাপ ভাবতেও নির্মলের যুবক মন চাইল না। বরং সে সকল দোষ আলোর উপর—এরকম একটা কথা ভাবতে পারলে শান্তি পেত নির্মল। কিন্তু পারছে না, কারণ একটা বিশ্রী কলুষ আকর্ষণ ওকেও মাঝে মাঝে আলোর কাছে টানে। তাই সে আলোর কাছে যাওয়া বন্ধ করতে পারে না। আলো-সামীপ্যের সান্দ্র আকাঙ্খা আজও নির্মলকে ঢাকুরিয়া অঞ্চলে নিয়ে এসেছিল। আলো-কে বাড়িতে না পেয়ে অবশ্যই সে বিরক্ত, উপরন্তু সত্যভাষণকে নেপথ্যে রেখে সামাজিক মঞ্চে এ সকল যুবক দর্শকের সামনে যথাসম্ভব রুচিবান হতে গিয়েও হয়েছে ব্যর্থ। আরও বিরক্ত আলো-সম্পর্কিত কয়েকটি যুবকের উল্লসিত কদর্য ভাষণে।

দুই

হঠাৎ বাবলুকে দেখতে পেল।

বাবলুকে দেখেই জিজ্ঞাসা করল অমল—দিদি আছে ?

বাবলু মৌন উত্তর দিল ঘাড়টা একদিকে হেলিয়ে। ত্রস্তপদে রাস্তা ধরে এগিয়ে চলে গেল। তানাহলে অমল বাবলুর পড়াশোনা সম্পর্কে কিছু কথা বলত। অর্থাৎ অমল পনের বছরের মধ্যকিশোরের কাছে প্রমাণ করতে চায়, বাবলু সম্পর্কেও তার জিজ্ঞাস্য এবং স্নেহ আছে। শুধু বাবলুর দিদি সম্পর্কেই নয়। অমল ভাবল, বাবলুর চোখটা বেশ সুন্দর, প্রায় দিদির মত। ঐ চোখ প্রজ্জ্বোল জীবনের প্রতীক এবং অতৃপ্তি সর্বদা কি যেন খুঁজে বেড়ায়।

বাবলু অনেকদূর চলে গেছে, দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু অমল তখনও মাত্র কয়েক হাত দূর বাবলুদের বাড়িতে পৌঁছতে পারছিল না। রাস্তা দিয়ে চলেছে সুবেশ তরুণী। বিশেষ করে অমল তরুণীর বলিষ্ঠ নগ্নবাহু এবং নিতম্ব দেখল এবং নগ্ন কোমরটাও। বুকের দিকেও একবার তাকাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এর আগেই মেয়েটি সামনের দিকে এগিয়ে চলে গেছিল অমলকে পেছনে রেখে। অমল থুতু ফেলে ঢোক গিলল। দেখল আলোদের একতলা বাড়ির ছাদে একজোড়া কবুতর-কবুতরী। রিরংসা প্রবৃত্তিতে নিমগ্ন। কবুতর দেখতে গিয়ে অমল দেখল সাদা থান কাপড়। আলো এবং বাবলুর

বিধবা মায়ের থান কাপড়ের স্থানে স্থানে ছেঁড়া অমল লক্ষ্য করল। অমল ভাবল, আলোর মার ম্লান হয়ে গেছে, কিন্তু আলোর হয় নি।

কব্জি ঘড়িতে তখনও দশটা বাজেনি। অমল ঘড়িটা খুলে চাবি দিল। আলোদের সদর দরজা খোলা থাকা সত্ত্বেও ভেজানো ছিল। ঘরের বাইরে এবং ভিতরে যাওয়ার আরও একটি দরজা পেছনের দিকে আছে। সাধারণতঃ আলোদের ঘনিষ্ঠ লোকেরা বা আত্মীয়রা সেখান দিয়ে ঢোকে। যদিও আত্মীয়দের সাথে আলোদের সম্পর্ক অল্প।

সদর দরজার সামনেই একফালি বারান্দা। সদর দরজা খোলাই ছিল। অমল দরজার সামনে দাঁড়াল। অমল না হয় এসেছে কিছু সময় কাটাতে। কিন্তু আলো হয়তো ঘর থেকে বের হয়ে গেছে। হয়তো অন্য কোন হৃষ্ট যুবকের সাথে সতত প্রফুল্ল কথাবার্তায় নিয়ত। অমল দরজায় কান রেখে শুনতে পেল একজন মহিলার কথা। আলোরও হতে পারে আলোর মারও হতে পারে। ওদের দুজনের গলার স্বর প্রায় একই। অমল দরজায় মৃদু টোকা মারল। পকেটে হাত ঢুকিয়েই বের করে নিয়ে এল। ভাবল সিগারেট এখন ধরাবে না।

দরজা খুলতেই অমল আলোর মাকে দেখতে পেল। অমল কোন কথা বলার আগেই আলোর মা বলে উঠলো—এসো, এসো অমল। কি ব্যাপার বলতো, অনেকদিন আসনি।

অমল ঘরে ঢুকল। আলোর মা অপর্ণাদেবী দরজায় ছিটকিনি তুলে দিয়ে বন্ধ করে দিলেন।

অমল বললে—গতকাল একবার সন্ধ্যার দিকে আসবো ভেবে-ছিলাম। কিন্তু বন্ধু-বান্ধবের আড্ডায়—

কথা শেষ না হতেই অপর্ণাদেবী বললেন—ইনি হচ্ছেন যাদব সরখেল। আলোর বাবার বিশেষ বন্ধু। আমাদের পরিবারের

সাথে অনেক দিনের ঘনিষ্ঠতা। পূর্ববঙ্গে আমাদের বাড়ির পাশেই থাকতেন। আলোর বাবা মারা যাবার পর যাদব বাবুই বলতে পার একরকম অভিভাবক। আর এর নাম অমল চৌধুরী। কলেজের অধ্যাপক।

অমল নমস্কার জানাল। যাদব সরখেল কোনরকমে ডানহাতের তালু ভাঁজ করে কপালে ঠেকিয়ে প্রতিনমস্কার জানালেন।

অপর্ণাদেবী চেয়ার থেকে উঠে বললেন—তুমি একটু অপেক্ষা কর। আমি আলোকে এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

অমল বললে—আলো কি খুব ব্যস্ত আছে? তাহলে থাক। আমি চলি।

অপর্ণাদেবী ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার মুখে বললেন—না না. ব্যস্ত নয়। এইতো দেখে এলাম শুয়ে শুয়ে কি যেন একটা পড়ছিল।

যদিও এই মুহূর্তে যাদব সরখেলকে অমলের ভাল লাগছেনা, উপরন্তু মনের বয়স ছোঁয়ার বাইরে। শুধু তাই নয় চোখ দুটো এতো ছোট যে যাদব সরখেলের শৌখিন চশমাতেও তার বিশালতার রূপ পাচ্ছে না। এবং ঠোট দুটো পাতলা, নাকটা সামান্য থ্যাবড়া রঙটা মাজাঘসা, মাথাটা ছোট, মুখটা মাংসে পূর্ণ ইত্যাদি ইত্যাদি থেকে আদিমতার গন্ধ অমল স্পষ্টতঃ বুঝতে পেরে অসহ্য বোধ করতে লাগল।

আলো বড্ড বেশি ঘুম কাতুরে। তানাহলে ওরকম একটা লোভণীয় দেহ তৈরী করতে পারে। যাদর সরখেল ভদ্রলোক অন্তত পক্ষে একটা কথাও বলতে পারতো। অমল অধ্যাপক, গাম্ভির্য একটা মুখোস হলেও ওটা অবশ্যই এক্ষেত্রে প্রয়োজন।

তথাপি অমল দেয়ালের উপর একটি মোটাসোটা টিকটিকির দিকে দৃষ্টিরেখে বললে—এখানে আপনি কি করেন?

যাদব সরখেল গোল গোল মুখটায় হাসি হাসি ভাব এনে উত্তর দেয়—ব্রেবোর্ণ রোডে ব্যবসা আছে। অবশ্য খুব বড় ব্যবসা নয়। ছেলেই দেখাশোনা করে।

যাদব সরখেল ছেলের কথা বলতে গিয়ে মনটাকে গুটিয়ে আনলেন। তিনি বললেন—ছেলে কি আর একা পারে। কত আর বয়েস হবে, এই আপনার মতই। তাই আমাকে রোজই একবার যেতে হয়।

অমল যাদব সরখেলের কথা গুলো কিছু শুনল কিছু শুনলনা। আলো খুব দেরি করছে, দেরি করেও।

কাকাবাবু আপনাকে মা ডাকছে—আলো পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল।

যাদব সরখেল চেয়ার ছেড়ে আলোর পাশ দিয়ে ভিতরে চলে গেলেন। অমল আলো-কে দেখল। হাওয়ার সঙ্গমে নষ্ট এবং উচ্ছৃঙ্খল চুল। কাজলের স্পর্শে উজ্জ্বল চোখ। তাঁতের শাড়ির সযত্ন বাঁধনে প্রকাশিত পুষ্ট যৌবন। এই দুপুরে আলো যেন কোন এক গ্রামের মেঠো এবং গেছো, অন্তরে অফুরন্ত যৌবনরসে-ভরা স্নিগ্ধ যুবতী।

অমল পাঞ্জাবীর পকেট থেকে পানামার বাক্স বের করে বললো—কি করছিলে? কি রকম একটা ঘুম ঘুম ভাব। অসময়ে এসে অসুবিধা করলাম না ত?

আলো জানলার পর্দা টেনে দিয়ে বাইরের রৌদ্দুরকে আটকে দিল। আলো বললে,—সুহাসরঞ্জন গুপ্তের একটা বাজে উপন্যাস পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম প্রায়।

অমল দুঠোটের মাঝখানে পানামাকে স্থাপন করে অস্পষ্ট স্বরে, আলো-কে বললে—সুহাসরঞ্জন গুপ্তের বই পড়লে ঘুম পালা করে আসে। এ যুগে বটতলা সিরিজ অসহ্য। কি করে পড়? রুচিতে বাঁধে না?

অমল ঠোঁট থেকে সিগারেট দু-আঙ্গুলের মধ্যে রেখে বললে—পর্দাটা একটু টেনে দাও।

আলো হেসে জবাব দিল—আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। মা এখন আসছেন না।

সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে অমল বললে—তোমাকে একদিন কলেজ ষ্ট্রীটে দেখলাম। পাশে ঐ ভদ্রলোকটি কে?

আলো সরল জবাব দেয়—কবে কখন কোনসময় দেখেছেন? তবেতো বলতে পারব কে ছিলো আমার সাথে?

অমল বললে—গত বুধবার। বিকেলবেলা। ফুলপ্যাণ্ট, কোকড়ান চুল, হাতে সিগারেট, লম্বা কালো কালো চেহারা এ-রকম এক ভদ্রলোক।

আলো বললে—সহপাঠি। ভাল সমালোচক। আপনি অসনি সেনগুপ্তের নাম শোনেননি? যাক্ আপনার প্রবন্ধটা পত্রিকায় দেখলাম।

অমল পর্দার ফাঁক দিয়ে আকাশের মৌনছোঁয়া পেল চোখে। অমল বললে—প্রবন্ধটা পড়লে না কেন? কোথায় দেখলে? তোমাদের ঘরেত আবার পত্রিকার বালাই নেই।

আলো চেয়ারে বসেছিল অমলের বরাবর। ঝুলানো পাদুটো সামান্য দোলাতে দোলাতে বললে—বাবলুর শিক্ষকের কাছে।

আমাদের বাড়িতেই একটা ঘর ভাড়া নিয়ে আছেন। আপনি কোন দিন তাকে দেখেন নি ?

বিস্ময়ে চোখদুটোকে ছোট করে এনে অমল বললে—তাকে দেখেছি বলে আমার ত মনে পড়ছে না।

আলো অবাক অবাক চোখে বললে—একি ? অবশ্য আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তিনি ঘর থেকে বের হন না। এমন কি কারো সাথে কথা বলেন না। একটু তান্ত্রিক ধরণের। মা কালীর খুব ভক্ত। যদিও দশটা পাঁচটা অফিসে কাজ করেন। এ ছাড়া সবসময় দরজা বন্ধ করে ঘরেই থাকেন।

অমল বলে—কি রকম দেখতে ভদ্রলোক ?

আলো উত্তর দেয়—যোগ আসন করা স্বাস্থ্য, ফরসা লম্বা। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি।

অমল সিগারেটে টান দিয়ে নাক দিয়ে ধূয়ো ছাড়ছিল।

অমল বললে -বুঝতে পেরেছি। তান্ত্রিক হলেও গেরুয়া বা ও ধরণের কোন কাশায় বস্ত্র পরেন না। ধুতি পাঞ্জাবী পরে বেশ ফিটফাট থাকেন। আমার সাথে একদিন কথাও হয়েছে। কথায় কথায় আধ্যাত্মিকতা। বাবলুকেও প্রায়ই ভদ্রলোকের সাথে দেখি।

আলো বলে—বাবলুকে খুব ভাল বাসেন। কোন দরকারে বাবলুকেই ডাকেন। তখনই যা গলা শুনতে পাই। ঘর ভাড়া নেওয়ার পর থেকে কোন দিন দেখলাম না আমার সাথে বা মার সাথে কথা বলেছেন। আমাদের দেখলেই মাথা নিচু করে চলেন। আমার সামনে ভদ্রলোকের নম্র চলা দেখলে মনে হয় সত্যি আমরা মায়ের জাত। যদিও মাঝে মাঝে হাসি চেপে রাখতে পারিনে।

অমল বললে—খুব ভাল লোক দেখছি। তাছাড়া তান্ত্রিক।

আলো বললে—সত্যি ভাল লোক। বাবলু রোজ পত্রিকা নিয়ে আসে সকাল বেলা পড়া শেষ হওয়ার পর।

অমল আলোর মুখের দিকে চোখটা নিয়ে বললে—কোন্ অফিসে কাজ করেন, জান ?

আলো চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে বললে—না। আপনি বসুন আপনার জন্য চা নিয়ে আসি।

অমল বললে—এই দুপুরে ! ষ্টোভ ধরাতে হবে নিশ্চয়। কষ্ট করে লাভ নেই। বরং বস, গল্প করি।

আলো চটপট উত্তর দেয়—দুপুর কোথায়। মাত্র সাড়ে দশ।

তবু আলো চলে গেল। একমুঠো খুসীর ফাগ ছড়িয়ে চলে গেল প্রজাপতির ছন্দে। অমল উঠে জানালার ধারে গেল। কয়েকটা চিল সকাল গড়ানো স্থির আকাশে। পাশের বাড়ির ছাদের আলসেতে দুটো কবুতরের নরম গলা অনবরত নড়ছে। অমলের হাতে সিগারেট পুড়ছে।

আলো চপল, প্রগলভ নয়। আলোর উজ্জ্বল চোখ কিছুই চায় না, শুধু টানে। তবু যেন কোথায় আছে একটা ছন্দ পতন। আছে ছন্দ মিলের কাঠিন্য। ধরা যায়, আবার যায় না। বোঝানো যায় বুঝতে পারা যায় না।

অমল সিগারেটে শেষটান মেরে আগুনটা নিভিয়ে ফেলতে যাবে ঠিক সে সময় অমল শুনতে পেল বাইরের দরজায় কড়া নড়ার শব্দ। অমল দ্রুত সিগারেটের টুকরাটা ফেলে দিয়ে দরজার ছিটকিরি খুলে দিতেই বাইরের লোকের ধাক্কায় দরজাটা ফাঁক হতে অমল দেখল, এক ভদ্রলোক।

বাইরে থেকেই যুবক বললে—আলো বাড়িতে আছে ?

অমল ছেলেটিকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছিল না। দরজার কপাট সম্পূর্ণ মুক্ত করে অমল বললে—আছে। ভেতরে আসুন।

কিন্তু পরক্ষণেই যুবককে চিনতে পেরে অমল বললে উৎসাহ না দেখিয়ে—নির্মলবাবু যে।

অমল সরে দাঁড়াল। নির্মল ফুলপ্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে অমলের পাশ দিয়ে ভেতরে ঢুকল। অমল দরজা বন্ধ করল। একটি চেয়ারে নির্মল, অন্যটিতে অমল চুপচাপ বসে রইল। নির্মলের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিল অমল। গৌরবর্ণ দেহে একটি ছন্দের মিল আছে অবশ্যই এবং কোকড়ানো একগুচ্ছ চুল গুলো সযত্নে পিছনের দিকে টেনে নেওয়া। রেয়ন প্যাণ্টের রঙের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সার্টের রঙ যেন সচেতন মনের বিজ্ঞাপন (এবং নিজের আর্থিক অবস্থাকেও অতি প্রত্যক্ষভাবে) সহজেই ধরা পড়ে।

নির্মল সযত্নে তুলে ধরল উইলসের প্যাকেট। অমল তুলে নিল। যদিও অমল একবার ভেবেছিল নির্মলকে কোন সূচীপত্র না দিয়ে প্রশ্ন করবে, আলো আপনার কে হয়, কিন্তু এখন আর সে কথার উল্লেখ করতে পারল না। আগুন সংযোগে উইলসে একটা লম্বা টান দিল, পূর্বভাবনার কপাটে গোদরেজ তালা মেরে। বরং এখন আত্মমগ্ন হওয়াই ভাল।

অমল ভাবল, নিষিদ্ধ ভাবনায় মনকে মুক্ত করে দিয়ে এবং আলোর আধুনিক নারীত্বের উগ্র, গন্ধ থেকে আপাতঃ দূরে গিয়ে নির্ভার শূন্যতার আশ্রয়ে কতক্ষণ বিশ্রাম করা এখন শ্রেয়। এই মুহূর্তে আলোর আসা একান্ত প্রয়োজন, নতুবা আমরা কয়েকজন যুবক যথা পরেশ, নির্মল, পরিমল, আমি এবং হয়তো আরও অনেকে আমাদের নিজ ব্যক্তিত্বের কথা ভুলে গিয়ে হঠাৎ চাঁদের মোহে মুগ্ধ হয়ে তর্কের জাল বুনবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতে পারতাম। ভাগ্য ভাল, এখন অবশ্য মাত্র দুজন আমি এবং নির্মল। যদিও জানি যে চাঁদের কোন নিজস্ব আলো নেই। এমন কি চাঁদে নেই কোন পৃথিবীর

মত নির্মল শ্যামল নিসর্গ চেতনা। শুধু খোরল, পাথর। শুষ্ক, তৃষ্ণায় কাতর।

অবশেষে আলো এল। মনে হল, পাণ্ডিত্যের চূড়োয় প্রজাপতির আবির্ভাব। কারণ, বোধহয় আলোর শাণিত বুদ্ধি আছে, এম, এর ছাত্রী। একে আড়ালে চুমো খেতে পাওয়া, অমল ভাবল,—তাহলে ভাগ্যবান।

চোখকে চায়ের কাপের দিকে রেখেই বললে—ধরুন আপনার চা।

অমল চায়ের কাপ ধরতে গিয়ে আলোর চোখ, চোখ থেকে আশ্চর্য্য রক্তাভ পাতলা ঠোটের দিকে তাকাল এক মুহূর্ত।

তখন আলো চোখ তুলে নির্মলকে দেখে মুষ্টিমেয় কপট বিস্ময় ছড়িয়ে দিয়ে বললে—আপনি? কখন এলেন? অনেকদিন হল ডুব মেরে আছেন।

আলো নির্মলের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

অমলের প্রতি মোটেই না তাকিয়ে আলো প্রশ্ন করল নির্মলকে —তারপর হঠাৎ কি মনে করে।

আলো উপর্বিষ্ট নির্মলের চেয়ারের হাতলে বসল। নির্মল আলোর ভারী স্পর্শে একটু সঙ্কোচে নড়ে উঠল। ঘাড়টা তুলে আলোর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—ভাবলাম যাই রোববারের সকাল কাটিয়ে আসি আলোর কাছে। এর আগে একদিন এসে দেখলাম বাড়িতে তালা ঝুলছে। বাড়িটা দেখতে বেশ হয়েছে। তোমার বাবা বেশ সুন্দর বাড়ি করেছেন।

আলো উত্তর দেয়—কিন্তু দুঃখ, দেখে যেতে পারলেন না।

নির্মল বলে—মরণশীল মানুষের ক্ষেত্রে ওটা নতুন কিছু নয় আলো। মাসিমা ভাল আছেন? বাবলু কোথায়?

আলো চেয়ারের হাতল থেকে উঠে-এসে বললে—আপনার গলা শুনে মা ঠিক আসবে। বাবলু হয়তো কোথাও গিয়েছে।

অমল প্রথমবার ভেবেছিল, কাপটা আলোর হাতে না দিয়ে মাটিতেই রেখে দেওয়া এখন ভাল। তথাপি ওদের কথায় একটু বাঁধা পড়ুক এই ভেবে অমল বললে—কাপটা।

আলো অমলের হাত থেকে কাপটা নিতে গিয়ে বললে—আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। এঁর নাম অমল চৌধুরী। অধ্যাপক। অমলবাবু, ইনি হচ্ছেন নির্ম্মল লাহিড়ী। এ বছর ডাক্তারি পাশ করেছেন।

অমল এবং নির্ম্মল হাতজোড় করে পরস্পরকে নমস্কার জানাল কপট গাম্ভির্যে এবং অপ্রশস্ত হৃদয়ের সাস্ত আন্তরিকতায় বিনীত সম্ভাষণ জানাল না কেউ। অমল এবং নির্ম্মল সন্নিকটবর্ত্তী হয়েও এবং উভয় উভয়ের আধুনিক মনের সাদৃশ্যের গোপন পরিচয় পেয়েও অছিলায় ইচ্ছাকৃত ভাবে দূরে সরে থাকতে যেন এই মুহূর্ত্তে চাইছে।

আলো এবং নির্ম্মল আবার শুরু করল গল গল করে গল্প, তৃতীয় ব্যক্তিকে উপেক্ষা নয়, অনেকটা অস্বীকার করে। একসময় অমলের চোখটা এসে স্থির হয়ে গেল দেওয়ালে টানানো দেওয়াল পঞ্জীর দিকে।

অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে কালিদাসের অনাথ মেয়েটি যার নাম ছিল শকুন্তলা, নিরত তপস্যায় মগ্ন। আর্ত্ত নয়নে দৃষ্টি তার শূন্য, কিছুটা ধূমল এবং সান্ধ্য। শিথিল বেশবাস। এমন কি কাঁচুলির বন্ধনও। দিগন্ত প্লাবিত বলিষ্ঠ রৌদ্রে ভেজা উদ্ধত দুর্দ্দম দুর্বার শকুন্তলার যৌবন, যেমন আলো। নগ্ন পায়ের কাছে কয়েকটা বৃন্তচ্যুত ধূলি-ধূসরিত ফুল। অদূরে আড়ালে দুই সখি হরিণ সহ অপেক্ষামান।

অমল হঠাৎ ভেবেই ফেললো, এ-যুগে রাজা দুষ্মন্ত না থাকতে পারে মানুষ দুষ্মন্ত প্রচুর মেলে। কি ভেবে অমল উঠল। পাঞ্জাবীর প্রান্তভাগ টেনে ঠিক করল। কোঁচাটা বাঁ পকেটে ঢোকাতে গিয়ে বললে—চলি।

আলো বললে—যাচ্ছেন ? ভেবেছিলাম থার্ডপেপারটা একটু বুঝে নেব। আচ্ছা, আর একদিন আসবেন।

অমল দরজার কাছে গিয়ে নির্মলকে উদ্দেশ্য করে হাত তুলে বললে—নমস্কার চলি।

ঘর থেকে অমল বের হয়ে এল। রাস্তায় নেমে একবার পেছন দিকে তাকিয়ে দেখল দরজা বন্ধ। আলো তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দিয়েছে।

অলো দরজায় ছিটকিরি তুলে নিয়ে নির্মলকে বললে—বল এবার কোন হাসপাতালে আছো ?

ভবানীপুরে ডিসপেনচারী খুলে বসেছি—নির্মল উত্তর দেয়।

সেত জানলাম। এছাড়া আর কি করছ—চেয়ার টেনে এনে নির্মলের কাছে এসে আলো বসল।

আর জনসাধারণের কল্ শুনছি। চল ঘুরে আসি। সপ্তাহে এই একটি দিনই আনন্দ উপভোগের সময় পাই। মাঝে মাঝে রোববাবের সকালটাও নষ্ট হয়। যাবে ?—নির্মল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

যাব। আজ নয়, আসছে রোববার। দাঁড়ালে কেন ? বস—আলো নির্মলের হাত ধরে বসাতে যাবে সেসময় নির্মল আলোকে চেয়ার থেকে টেনে তুলল।

নির্মল বললে—ভিতরের ঘরে কে আছে ?

আলো দাঁড়িয়ে থেকেই উত্তর দেয়—মা আর যাদব কাকা।

নির্মল আলোকে জড়িয়ে ধরে মুখটা আলোর মুখের কাছে নিয়ে যায়। আলো নির্মলের উষ্ণ নিশ্বাস মুখের উপর বুঝতে পারে।

আলো নির্মলের মুখে হাত রেখে বলে—এ রকম করো না। সময় হোক।

নির্মল সহজ সুরে বললে—তোমাদের সাথে আমার প্রায় চার

বছরের বন্ধুত্ব। অথচ এই চার বছরের ভেতর একদিনও তুমি চুমো খেতে দিলে না। প্রত্যেক বারই বল, সময় হোক।

নির্মলের বাহুর বেষ্টন থেকে আলগোছে নিজেকে সরিয়ে এনে আলো বলে—যেমন বিয়ের কথা বললেই পুরুষরা বলে, সময় হোক।

নির্মল বলে—তুমি বা তোমার মা একদিনও তো বিয়ের কথা বলো নি।

আলো চেয়ারে বসে বলে—বিয়েরও প্রস্তুতি থাকা দরকার। ডাক্তার হলেই বা প্রচুর অর্থ উপার্জন করলেই বিয়ে করা যায় না। সেখানে ভোগেব নেশা হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়। বুঝলে? দাঁড়িয়ে থেকে থেকে কি দেখছ আমাকে। বস।

আলো আবার নির্মলের হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিল।

নির্মল চেয়াবে বসে বললে—দেখছি একজন নিখুঁত মেয়েকে।

আলো বলে—কি সে নিখুঁত? দেহে না মনে।

নির্মল উত্তর দেয়—তুটোতেই।

বসো, মাকে ডেকে আনছি। অনেকদিন পবে এলে। মা খুব খুশী হবেন।—আলো ঘর থেকে বের হতে যাবে ঠিক সেসময় অপর্ণা দেবী ঘরে ঢুকলেন।

এতদিন পর মনে পড়ল, আমাদের—অপর্ণাদেবী নির্মলকে বললেন।

এই একটু কাজে ব্যস্ত ছিলাম—নির্মল সলজ্জ হাসিতে বললে, আজ চলি মাসিমা। আর একদিন আসব—নির্মল চেয়ার ছাড়ল। এত তাড়া কিসের? চা খেয়ে যাও—অপর্ণা দেবী বললেন।

সে আর একদিন হবে'খন। বলা যায় না যদি কোন জরুরী কাজ এসে হাজির হয়। ডাক্তারদের তো ওই একটা বিশ্রী ব্যাপার—নির্মল দরজার কাছে গেল।

তাহলে আর একদিন এসো—অপর্ণা দেবী দাঁড়িয়ে থেকেই বললেন।

নির্মল রাস্তায় এসে পেছনে তাকাল। দেখল, আলো দাঁড়িয়ে আছে একপাট কপাট জড়িয়ে। নির্মল হাসল, আলোও। আলো নির্মলের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা ভাবান্তর লক্ষ্য করতে ব্যস্ত রইল। নির্মল লাহিড়ীর সাথে কয়েক বছরের ঘনিষ্ঠতায় আলো বুঝতে পেরেছে কলঙ্কহীণ মানব আত্মা দেহের স্নায়ুতে আবর্তিত। আলো হঠাৎ নির্মলের বয়সটা অনুমান করল। নির্মলের পাশবিক চোখে ক্ষুধার তীব্রতায় আলো সহজেই বুঝতে পারল, নির্মল ত্রিশ পেরিয়েছে।

অপর্ণা দেবী ডাকলেন—দরজাটা বন্ধ করে দে। অমল হঠাৎ চলে গেল কেন? পড়াটা একবার দেখিয়ে নিলে পারতিস্। এম, এ-র পড়া ওতো সহজ নয়।

আলো দরজা বন্ধ করে উত্তর দিল—সে হবেখন।

আলো ভিতরে চলে গেল।

অপর্ণাদেবী ম্লান ভাবনায় বিদ্ধ হয়ে বেদনা বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে চিন্তার উচ্ছৃঙ্খলতায় প্রশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। যদিও অপর্ণা জানেন, তিনি, আলো এবং বাবলুর চল্লিশের কিছু উর্দ্ধ মাতা, তথাপি যাদব সরখেলকে গোপনে সরিয়ে দিতে হয় পেছনের দরজা দিয়ে। বাবলু এখনও বাড়ী ফেরেনি। কোথায় গেছে অপর্ণা জানেন না। আলো এখন স্নান করবে। খাওয়াদাওয়ার পর একটু শোবে। তারপর সেজেগুজে বের হবে। কোথায় যাবে অপর্ণা জানেন না। তবে বুঝতে পারেন, আলো মাকে মিথ্যো কথা বলে বের হয়ে যাবে। আলো-কে দেখে অপর্ণা আলোর বয়স্ক যৌবনকে বুঝতে পারেন, ইন্দ্রিয়ের অম্লান বিশ্বাসে নিমগ্ন মন শীতের দুপুরের কত রূপালি উজ্জ্বলতায় ভাস্বর। আবার উদার যুবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে

অমল চৌধুরী, পরেশ সেন, নির্মল লাহিড়ী, প্রতাপ ভড় এবং আরও অনেকে। শতছিন্ন সংসারের চাপে নুয়ে পড়া দেহে তুলে নিতে হবে এইসব কদর্যের স্থূল সঞ্চয়ণ। কারণ, অপর্ণা স্পষ্টই জানেন, লালরঙের বেনারসী, ফুলের মালা, শঙ্খের শব্দ, সানাইয়ের উচ্ছ্বাস, উজ্জ্বল সিঁদুরের টিপ এবং একটি শুভ্র রাণীর মতো শোলার টোপর, অবশেষে স্বচ্ছ মানবীয় মদিরার পাত্রে স্বর্গের স্বাদে দীপ্তমান চোখ ও মন, সে সুখ আলোর নেই।

এবং যাদব সরখেল সেখানে প্রধান এবং চতুর নায়ক। দুপুরের তাপে উত্তপ্ত হয়ে মাঝে মাঝে গল্প করবে অপর্ণার সাথে। স্কুল না থাকলে বাবলু তখন ঘুমে অচেতন। ঘুমোক গভীর নিদ্রায়। তবু ছেলের স্পন্দন অপর্ণা শুনতে পান যাদবের সাথে গল্প করতে করতেও। যাদব গল্প করেন। ওঁর স্ত্রীর অসুখ বেড়েছে। ডাক্তার বলেছেন আরও দুবছর বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। 'আরও' কথাটার উপর জোর দিয়ে যাদব গোপন নিশ্বাস ফেলেন। অপর্ণা বুঝতে পারেন, যাদবের গোপন নিশ্বাস কি চায়। ছেলের বুকে হাত রাখেন। হাত রেখেও যাদবের সাথে কথা বলেন। পান চিবোন। যাদবই নিয়ে আসেন কিনে দুই খিলি পান। অবশেষে বাবলুর ঘুম ভাঙ্গার সময় হলে অপর্ণার হাতে কিছু টাকা দিয়ে যাদবের কথা বলা। শিবেশ্বর আমার অনেক দিনের বন্ধু। তোমাদের কষ্টে আমাকেই তো দেখতে হবে। বাবলু চাকরী পেলেই কিম্বা আলো মাষ্টারী পেলেই না হয় আমার টাকাটা শোধ করে দিও। এখনতো ধরো। অপর্ণা উপকারের মৌখিক সম্ভাষণে ধরতে বাধ্য।

সময়ে সময়ে অপর্ণা দেবীর মন মনের অন্ধকার কোঠায় কেঁদে ওঠে। স্বভাবতই অন্ধকারে তিনি পথ হারান। স্বস্থ, দৃঢ় পথ। তিনি অন্ধকারে আলোর জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। আলোর জন্য সহায়তা চান। কিন্তু সহায়তার স্বীকৃতি নির্মল আলোয় বিভূষিত নয়

তা অপর্ণাদেবী অবশ্যই বুঝতে পারেন। অকুণ্ঠীত চিত্তের অভিনয়ে যাদব সরখেলের টাকা বাবলুর চোখের দিকে তাকিয়ে এবং আলোর মুখের কথা ভেবে গ্রহণ করেন।

মাঝে মাঝে একা একা নিভৃত ঘরে স্বামীর ফটোর দিকে মুখ রেখে কেঁদে ফেলে প্রার্থনা করেন—

—কি করবো তুমি বলে দাও। তোমার এই ছেলেমেয়েকে নিয়ে আমি কি করতে পারি। কেন তুমি সবটাকা খুইয়ে এই বাড়ি করলে। অথচ ভগবানকে সাক্ষী রেখে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তোমার মৃত্যু মুহূর্তের পাশে। আমি ত রইলাম। আমি ওদের আপ্রাণ দেখব। কথাগুলো কি আর বলতে পারছিলাম কান্নায় বুক ফেটে যাচ্ছিল।

কিন্তু এখন,

ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা কর। আমি আর পারছি না।

তিন

মা—

ডাকটা শুনে অপর্ণাদেবী চমকে উঠেন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন, বাবলু। বললে—

—কি হয়েছে বল।

বাবলু মায়ের কাছে এল।

—নরেশ কাকার সাথে বেড়াতে যাচ্ছি।

অপর্ণা নেকড়া জলে দিয়ে ঘরের মেঝ মুছতে মুছতে বললে—রাত কর না। পড়াশোনা করতে হবে ত। এদিকে পরীক্ষা এসে গেল। মনে রেখ বিজ্ঞান নিয়ে পড়ছ। দিন রাত পড়তে হবে। তাছাড়া সাধুটাধুর সাথে বেশি বেড়ান ভাল নয়। যাও। বেশি রাত যেন না হয়। আলোর ত ঠিক নেই কখন ফেরে।

বাবলু একলাফে ঘর থেকে বের হয়ে এল। বারান্দা থেকে জুতো পায়ে গলিয়ে নরেশ-কাকার ঘরে চলে গেল। ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়।

নরেশ কাকা বাবলুকে দেখে খুশী হলেন। বললেন—মায়ের অনুমতি পেয়েছ ?

বাবলু সম্মতিসূচক উত্তর দিল, কোন কথা না বলে।

নরেশ চক্রবর্তী বাবলুকে কাছে টেনে নিলেন। জড়িয়ে ধরে সোহাগ প্রকাশ করলেন। ধুতি পরা শেষ হল। গেঞ্জি গায়ে দিয়ে আদ্দির পাঞ্জাবী চাপালেন। চুল আঁচড়ালেন। সম্মুখে মনোহর কালী মূর্তিকে প্রণাম করলেন। বাবলুর হাত ধরে ঘর থেকে বের হলেন।

অনেকের ধারনা, এ যুগে ভদ্র মানুষের (গণতন্ত্রের যুগে আমরা কেউ অভদ্র নই) তীব্র মানবতা বোধকে নিষ্ঠার সাথে মেপে নিয়ে এবং পুনরায় অভিনবরূপে সৃষ্টি করার প্রেরণায় নরেশ চক্রবর্তী বিয়ে না করেই থেকে গেলেন বাবলুদের একটি ঘর ভাড়া নিয়ে। কোন এক কালে পরিচয় ছিল শিবেশ্বর রায়ের সাথে, আলো-বাবলুর বাবা। সেই সূত্রে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে এখানেই থাকেন কালীমূর্তির সন্মুখে। কেউ বলে তান্ত্রিক, (কাশায় বস্ত্র পরিধান করেন না) অনেকের মতে কালীদেবীর একনিষ্ঠ পূজক। যুবকগণ বলেন, ভণ্ড। তবে সত্য, তিনি কেন্দ্রিয় সরকারের অধীনে একজন বড় চাকুরে। আলখোল্লার স্থান নেই পোষাকে। পাটভাঙ্গা শান্তিপুরী ধুতি আদ্দির পাঞ্জাবীতে অপূর্ব বিলাসী চিত্ত, এই নরেশ চক্রবর্ত্তীর। নির্জনবিলাসী এবং অনবতুল শিল্পী। ছবি আঁকেন ভাল। প্যাষ্টেলের কাজ জন্ম নেওয়া হিমালয়ের ঔরসে। ভাব-গম্ভীর নির্জন প্রশান্ত। যদিও ছবি আঁকাটাও বিলাস। বাবলুর প্রতি আকর্ষণ প্রবল।

অপর্ণাদেবী বিকেলের কাজ সেরে টুথব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজলেন। মুখে লাক্স মেখে গা ধুলেন। ভেজা থান পরে ঘরে আসেন। সিল্কের সাদা ব্লাউজ অপর্ণাদেবীকে ভাল মানায়, অপর্ণা তা জানেন। পাতলা থান গায়ে জড়ালেন। চুল বাঁধলেন। আয়নার কাছে গিয়ে ঘাড়ে পাউডার দিলেন এবং দর্পণে নিজের অপূর্ব্ব লোভনীয় এবং কমনীয় মুখশ্রী দেখতে গিয়ে যাদব সরখেলের কথা মনে হল। আরও মনে হল, যাদবকে বিকেলে আসা বারণ না করলে ভাল হত। কারণ এ সময় আলো-বাবলু থাকে না। দুপুরে কেউ না কেউ থাকে। আর তাছাড়া বিকেলটা-সন্ধ্যেটা বিশ্রী রস অপর্ণাদেবীর গায়ে ভর

করে। সেটা অনেক দিনের অভ্যেস, যখন শিবেশ্বর বাবু জীবিত ছিলেন। অফিস থেকে ফিরতেন। সেই অভ্যাসটা অপর্ণাদেবী এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। সেই ভয়ে তিনি যাদবকে বিকেলে আসতে নিষেধ করেছিলেন। যাদব সরখেল সেই নিষেধ রাখেন। তবু কদাচিৎ আসেন। অপর্ণার সেদিন ভাল লাগে আজও অপর্ণা দরজায় শব্দ শুনল। চট করে চুলটা আঁচড়ালেন। মুখে পাউডার ঘসে কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুছলেন।

অপর্ণাদেবী দরজা খুললেন। অমলকে দেখে তিনি খুশী হলেন বটে, তথাপি, আরও কিছু ভাবতে গিয়ে, অপর্ণা না ভেবে, অমলকে দেখে হাসলেন।

অমল বললে—আলো কোথায় মাসীমা?

অপর্ণাদেবী বললেন—আলো সেই তিনটের সময় বের হয়েছে। বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ভেতরে এসো।

অমল আলোর মার সজ্জা দেখে বিস্মিত এবং মোহিত হল। আলোর মার কথাশুনে অমলের মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের হল না। জড়ের মত স্থির এবং নিশ্চল হয়ে গেল।

অপর্ণাদেবী বললেন—এসো ভেতরে। গল্প করি। একটু বাদেই আলো এসে যাবে।

আলোর মার চল্লিশ বৎসরের স্বাস্থ্যের এত প্রাচুর্যের দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকা যায় না। চোখের দৃষ্টি বাসনার আগুনে জ্বলতে থাকে। অপর্ণাদেবীর উন্নত প্রশস্ত নিটোল স্তনের দিকে তাকিয়ে আলোর মাকে এই মুহূর্তে অশ্লীল মনে হলেও অমলের ভাল লাগে শুভ্রতায় আবৃত শুভ্র বলিষ্ঠ নরম স্বাস্থ্যটা। উত্তেজনার আনন্দের যন্ত্রনা অমল অনুভব করে। নাকে কানে উত্তেজনার মৃদু প্রলেপ। আলোর ভাবনা সেখানে পুড়ে ছাই। এ যুগের চিন্তাশীল অমল ভাবে, হয়তো ঐ দেহের প্রতি কামনা বাসনা থাকতে পারে,

থাকে না মাতৃত্বের প্রতি স্বার্থহীন এবং স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা, দায়িত্ব ও কর্তব্য। শ্রদ্ধা, দায়িত্ব ও কর্তব্য মনের উপর নির্ভর করে, দেহের উপর নয়। কারণ এই বিকেলে আলোর মার দেহটা কখনই মাতৃত্বের দাবী তুলতে পারে না। আর দেহ কখনও মা নয়। মা দেহাতীত ভাবনায় স্বর্গীয় দীপ্তি। সন্তানের কাছে মা সময় সময় দেহের জন্য সলজ্জ। মুক্ত নয় সেখানে আত্মা। অথচ আমরা, হিন্দুরা প্রতি বছর পুজো করি উলঙ্গ কালীমাতাকে, কি আশ্চর্য মুক্ত আত্মা।

অপর্ণা বললেন—কি ভাবছো বসবে না ?

অমল উত্তর দেয়—না মাসিমা চলি।

মনেহল অপর্ণা দেবী হাসছেন। হাসির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে করতে অমল দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে গেল। অমলের হঠাৎ মনে পড়ল, কেন সে মাঝে মাঝে যাদব সবখেলকে এসময় আলোদের বাড়িতে আসতে দেখে।

আপনার গল্পটা পড়লাম—জলের সাধারন কাঁচের গ্লাসে চুমুক দিয়ে আলো বললে। ছাই-দানিতে ছাই ঝেড়ে পরেশ পানামায় টান দেয়।

কি রকম লাগল—পরেশ আলোর নিচের ঠোঁটের বাঁ পাশে কালো তিলটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

গল্পটি দুর্বোধ্য হলেও আমার মনে হয় মেয়েরা ওরকম চিন্তা করে না। আমরা অর্থাৎ মেয়েরা যতই প্রগতির দোহাই দিয়ে চলাফেরা করি না কেন মন ঠিক বাঙ্গালিই রয়ে গেছে। স্নেহ এবং কোমলতায় ভরা, আর কাঁদতে পারা, এযুগের সাথে তফাৎটা এই, আগে ছিল সবই প্রকাশ্য, সবাই বুঝতে পারত। আর এখন গোপনে, কেউ যাহাতে বুঝতে না পারে—আলো চায়ের কাপটা টেবিলে রাখল।

আসল ব্যাপার কি জানেন, মেয়েদের সাথে এ যুগে মিশবার সুযোগ পেলেও, মনের কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। এর জন্যই গল্পকে একটু দুর্বোধ্য করে তুলতে হয় সস্তায় বাহাদুরি পাওয়ার জন্য, এতে অবশ্য আবার গল্প লেখার অক্ষমতা ঢাকা পরে। —পরেশ আলোর বুকের দিকে তাকিয়ে দেখল আলোর শাড়ির আঁচলটা অনেকটা সরে গেছে। দৃষ্টিকে দ্রুত চায়ের কাপে নামিয়ে এনে চামচ নাড়তে থাকে।

আলো উত্তর দেয়—অবশ্য এ যুগে অনেক মেয়ের মনে পাশ্চাত্য প্রভাব পড়ছে। যদিও সুযোগ এনে দিয়েছে বর্তমান যুগের যান্ত্রিক সমাজ। ওরা ভাবে, পাপ বলে কিছু নেই, পৃথিবীতে স্বনির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকতে হবে। ওরা বোঝে, ওরা নারী। নারীর মূল্য পুরুষের কাছে অপরিসীম। তাই আধুনিক নারী নারীত্বের সুযোগ গ্রহণ করে পুরুষের কাছে। নারীর মূল্য, টাকার মূল্য এক হয়ে যায়। পুরুষদেব কাছে সমর্থনও পাচ্ছে। তাই ওরা আজ হৃদয়বান বলিষ্ঠ মনের পুরুষ চায় না, চায় অর্থবান ভুড়িওয়ালা কার্তিক-মার্কা দুর্বল মনের পুরুষকে। ওরা ভুলে যায়, ওরা মায়ের জাত। মাতৃত্বের অপমৃত্যু ঘটছে দিন দিন। আমি হলপ করে বলতে পারি, এ স্রোত বেশিদিন চলবে না, আমরা আবার সেই ভারতীয় নারীতেই ফিরে যাব—আলো চায়ের কাপটা চুমুক দেওয়ার জন্য ঠোঁটের কাছে তুলে নিল।

পরেশ আলোর লোভনীয় গৌরবর্ণ দীর্ঘ দেহের দিকে আর তাকাতে পারছে না। যেন আর তাকানো যায় না। আলোর সুমিষ্ট বিনীত ভাষণে এবং বলিষ্ঠ বক্তব্যে দেহটা মিশে গেছে মনে

হল। কিন্তু বিভার পরেশ অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টি মেলে প্রশ্ন করল—সে দিনটা কবে আসবে ?

কামনার উত্তাপের জন্য পরেশ এসেছে। একটু আগেও সে ভেবেছে একটু ছোঁয়ার কথা। তাই পরেশ তার নিজের কাপটা আলোর কাপের অতি কাছে রেখেছিল, যদি আলোর লম্বা নরম আঙ্গুলের স্পর্শ মেলে একটু। শুধু একবার পায়ের আঙ্গুলের স্পর্শ পেয়েছে এবং আলো চট্ করে পা সরিয়ে নিয়েছিল।

আলো উত্তর দেয়। হাতে কাপ।

—আগে আমাদের আগুনে পুড়তে দিন। তবেতো বুঝবো কি রকম জ্বালা! বুঝব, সেখানে সুখ থাকতে পারে, আনন্দ নেই। নারীত্বে সুখ থাকতে পারে, মাতৃত্বের আনন্দ নেই। সুখ সর্বদাই আত্মতৃপ্তির পথ খোঁজে। লক্ষ্য তার ভোগের মন্দিরে। আর যুগটা হচ্ছে আত্মতৃপ্তির যুগ। আত্মতৃপ্তি আবার অর্থের উপর নির্ভরশীল। আনন্দ জীবনের সত্য এবং মংগলের পথ খোঁজে, লক্ষ্য তার পরমাত্মার মন্দিরে। পদ্মফুলের পাঁককে যেমন অস্বীকার করা যায় না, সেরূপ আমাদের জীবনের পাপবোধ ও গ্লানিকে অস্বীকার না করে জীবনপদ্মের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করতে হবে। আপনার নায়িকা বিভা সেনগুপ্তাও আধুনিক নারীর দলে।

আলো চা-এ শেষ চুমুক দিয়ে পাতলা মসৃন ছাপার শাড়ির আঁচল বা হাতের নিচ দিয়ে টেনে এনে উঠে দাঁড়াল। পরেশ সে সময় আলোর বুকের কাছ থেকে চোখ দুটো সরিয়ে এনে অবাক অবাক চোখে বললে—একি! উঠলেন যে, বেশ সুন্দর বলছিলেন। ভাল লাগছিল।

দাঁড়িয়ে থেকে কব্জি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আলো উত্তর দেয়—বসতাম, সাড়ে চারটা থেকে আমার জন্য একজন অপেক্ষা করছে। তাকে সঙ্গ দিতে হবে। ওকে দাঁড় করিয়ে রাখবার জন্যই আপনার

সাথে গল্প করলাম। আর আপনারওতো অফিসের সময় হয়ে এল।

পরেশ এই মুহূর্তে বুঝে উঠতে পারছে না সে কার সাথে কথা বলছে। সে নারী, কি যুবতী, কি বধূ, কি মাতা, কি কন্যা। একটি যুবক অপেক্ষা করছে। তাকে সঙ্গ প্রদান। কি অপূর্ব স্পষ্ট উক্তি অথবা নির্লজ্জ প্রকাশ। তবে কি ডগডগে চোখে পাপবোধের আত্মদহন।

তবু পরেশ ধূসর চোখে আলোর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—প্লিজ আর একটু বসুন।

আলো উত্তর দেয় চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে থেকে।

—আজ আর নয়। আর একদিন কোন এক নির্জনে বসে আপনার কবিতা গল্প শুনবো। আজ চলি।

আলো দ্রুত রেস্তরা থেকে বের হয়ে গেল।

অস্ফুট শব্দ করে পরেশ বলে উঠল—আশ্চর্য্য। অদ্ভুত একটি মেয়ে। মনটা হঠাৎ মোচড় দিয়ে উঠল পরেশের। হৃদয়ে গোপন যন্ত্রনার পরশ। প্রবল নিঃসঙ্গতাকে ভর করে পরেশ এগিয়ে চললো। শিয়ালদা রেস্তরার বিল মিটিয়ে দিয়ে পাথুরে জমির ওপর সঙ্গীহীন গাছটার দিকে তাকিয়ে পরেশ ভাবল, এ গাছটা বোধ হয় আর গাছ নেই যেমন পাখী আর পাখী থাকে না গৃহস্থ ঘরের খাঁচায়। বন্ধনে মুক্তি নেই অথচ স্বাধীনতাতেও নিয়ম আছে। রেস্তরার-ঘরে আগুনের উত্তাপ নিয়ে পরেশ ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট পথ না ধরে এগিয়ে চললো তারই কবিতাকে স্মরণ করে—এ যুগে আমরা ক্লান্ত ভাঁড় হয়ে চলছি। সুন্দরের গায়ে লেগেছে কাদা। বড় ভয় হৃদয়ে আমার, তবু আশা হে সুন্দর।

আলো-কে দূর থেকে দেখতে পেয়ে নির্মল কলকাতার দুর্বল আকাশে পাখী দেখতে চেষ্টা করল। তির্যক চোখে দেখল—আলো

রাস্তা পার হবার চেষ্টা করছে। সামনে দিয়ে একটি ছাই রঙের মোটর হর্ন দিয়ে চলে গেল। সম্মুখের কাটবোর্ড বোঝাই লরিটার জন্য ট্রাম দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক সে সময় আলো গতির উন্মাদ বেগে কাঠবোর্ড বোঝাই লরিটার সামনে দিয়ে ওধারের ফুটপাথে চলে গেছে। আকাশের নীলে উধাও মনের ডানায় আলো-কে দেখে নির্মল ভুলে গেল পয়তাল্লিশ মিনিটের ধৈর্য্যের যন্ত্রনা। আলো বললে—একটু দেরি করে ফেললাম। রাগ করনি ত? নির্মল মিথ্যা উত্তর দেয়—এইতো এলাম। পাঁচ মিনিট হবে হয়তো। চল হাঁটি।

আলো জানে নির্মল প্রথমে হাঁটবে। তারপর রেস্তরার কেবিনে ঢুকবে। নির্মল কোনদিন বলেনি আলোকে—এসো আমরা বসি এই সবুজ ঘাসের উপর। অথবা চল গঙ্গার ধারে বটগাছটার নিচে। দক্ষিণের হাওয়া গায়ে লাগবে। আর হাঁটব না। এবার বিশ্রাম করবো। জীবনের সকল ক্লান্তি সকল যন্ত্রনা দূর হবে। নির্মল আজও সেই একই সুরে একই কথায় পুনরাবৃত্ত করল—চল কিছু খাই। খিদে পেয়েছে।

আলো জানে, নির্মলের খিদে পেলে বরাবর সে মাংসের অর্ডার দেয়। নির্মল বড্ডবেশি মাংস ভালবাসে।

নির্মল জানে আলো আপত্তি করবে না। করবে না বলেই মিনতি দত্তের চেয়ে আলো-কে নির্মল বেশি পছন্দ করে। চুম্বনের অঙ্গীকারে মিনতি দত্তকে পাওয়া যায়, কিন্তু কথার বাধ্যে নয়। মিনতি দত্তের মার প্রশ্রয়ে উত্তাপের আনন্দ উপভোগ করছে মিনতি দত্ত। একদিনতো দেখেই ফেললো মিনতি দত্তের মা তাদের জড়ানো অবস্থাকে। তবু কিছু বললো না। বললে না, বের হয়ে যাও। অসভ্য, জানোয়ার অভদ্র। বরং জানলার পাশ দিয়ে চট্ করে সরে গেল। এর পরই হাসিমুখে মিনতিকে চা নিয়ে যাবার জন্য ডাকল। ডাক্তারের আর্থিক সম্মানকে এখনও নির্মল বুঝে উঠতে

পারছে না। অথচ মিনতি দত্তের বিপরীত সজ্ঞায় আলোর মন নির্মলের কাছে মাঝে মাঝে হীরের বস্তু। কয়েক বছরের ঘনিষ্ঠ আলাপেও নির্মল আলোর রক্তিম ঠোঁটের স্বাদ পায় নি। আলো টাকা ধার নিয়েও কঠিন এবং নির্মম। দুর্বল নির্মল ভাবে, আহা মেয়েটা খুব গরীব।

নির্মল এবং আলো কলেজষ্ট্রীটের একটি রেস্তরায় প্রবেশ করল। ওরা দুজনে কেবিনে গিয়ে বসল। আলো নিঃশব্দে পর্দা টেনে দেয়।

নির্মল বললে—আশ্চর্য্য মোহেতে তোমায় আমি দেখছি।

আলো গালে হাত দিয়ে নির্মলের শান্ত, অথচ শানিত চোখের দিকে তাকিয়ে বললে—সে ত অনেকদিন ধরেই দেখছ। যাক্ কি অর্ডার দেবে দাও।

নির্মল উত্তর দেয়—অর্ডার দিচ্ছি তুমি আমার সাথে ছয়টার শোতে সিনেমায় চল।

আলো হাসে। আলো স্নিগ্ধ। আলো বলে—আজ নয়, আর একদিন। তবে সন্ধ্যার শোতে নয়। আজকাল আমি সন্ধ্যার শোতে সিনেমায় যাই না। সেত তোমাকে একদিন বলেছি।

অথচ আলো স্পষ্ট বলতে পারল না—তোমার সাথে আমি আর কোনদিন সন্ধ্যার শোতে উঁচু ক্লাসে সিনেমায় যাব না। কারণ নির্জনতাও যে মাঝে মাঝে আগুন হয়ে দেহে প্রবাহিত হয় তা নির্মল এবং আলো উভয়ে জানে। অগত্যা আশাহত নির্মল প্রশ্ন করে—তাহলে বল কি অর্ডার দেব ?—নির্মল ওয়েটারকে ডাকবার জন্য শব্দ সৃষ্টি করল।

আলো উত্তর দেয়—তোমার খুশী।

আমার খুশী তোমার চুম্বন—নির্মল আলোর হাতটা ধরে কাছে আনবার চেষ্টা করল।

খুশীর সর্বশেষ পরিণতি আসুক। তার পর দেব তোমায় চুম্বন

—আলো ধীর হয়ে নম্র হয়ে হাতটা না ছাড়িয়েই বললো। পর্দা নড়ে উঠতেই ওরা দুজন ঠিক হয়ে বসল। ওয়েটার ঢুকতেই নির্মল অনেক কিছু অর্ডার দিতে যাবে। সে সময় আলো বললে—অত খরচ করে কি হবে? আর আজকে আমার কিছু টাকা চাই, বড্ড প্রয়োজন। চা খাব না, শুধু চিকেন স্যাণ্ডউইচ্। ব্যস। আর কিছু নয়।

নির্মল ওয়েটারকে নির্দেশ দিল।

নির্মল প্রশ্ন করে—তোমার এত টাকা কিসে প্রয়োজন হয়? মাসিমার কাছে শুনেছি তুমি টিউশনিও করছ।

আলো হাসে। আলো শান্ত। আলো বলে—জানতে চেওনা নির্মল। তোমার টাকা আমি শোধ করে দেব। কথা দিচ্ছি।

অশান্ত নির্মল হাসতে হাসতে কথা বলে—কি দিয়ে শোধ করবে? দেহ দিয়ে, নাকি অর্থ দিয়ে।

আলো লজ্জিত হয়ে বললে—তুমি আজ বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করছো। দিন দিন অশ্লীল হয়ে উঠছ। আর ঐজন্যই ডাক্তারি লাইনটা বিশ্রী।

নির্মল একটু নিস্তেজ হয়ে ক্ষমা প্রার্থীর ভঙ্গিতে বলে—কি আশ্চর্য, মেয়েরা একটা সামন্য কথাও সহ্য করতে পারে না। বিশেষ করে তুমি। এই নাও টাকা। আমার কথায় রাগ করনা।

আলো নির্মলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—নির্মল, এবার তুমি একটা বিয়ে কর। তোমার বিয়ে করার প্রয়োজন হয়েছে।

বিয়ে? এ যুগে! এত তাড়াতাড়ি? অসম্ভব। আর তাছাড়া তুমি তো আছ, যদি করি কোনদিন তাহলে তোমাকেই—নির্মল এমন ভাবে কথাগুলো বললো যেন সে এ ধরণের কথা শুনতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। আলো ধৈর্যশীল হয়ে কথাগুলো শুনল। চোখের পাঁপড়ি শান্ত ভাবে খুলে দিয়ে নির্মলকে দেখে। নির্মল হাসছে। হাতটা এগিয়ে দেয় আলোর নরম হাত তুলে নেবার জন্য।

আলো বুঝতে পারে। হাত সরিয়ে এনে আলো দাঁড়াল। আলো শান্ত অথচ নির্মম। স্নিগ্ধ অথচ দৃপ্ত। সংযত অথচ জাগ্রত।

অবশেষে দৃপ্ত কণ্ঠে আলো ঘোষণা করল—বড্ড দেরি হয়ে গেল নির্মল। আচ্ছা চলি। তোমার টাকা আমি অবশ্যই শোধ করে দেব।

পর্দা সরিয়ে পায়ের চটিতে দ্রুত শব্দ তুলে আলো রেস্তরা থেকে বের হয়ে গেল। নির্মল আহত পক্ষীর ন্যায় ঠোঁটে সিগারেট স্থাপন করতে করতে কেবিন থেকে বের হয়ে এল। কোনদিকে না তাকিয়ে নিঃসত্ব লজ্জার মূল্য মিটিয়ে দিয়ে দেখল রাস্তায় এসে আলো নেই কোথাও। চিকেন-স্যাণ্ডউইচ কেবিনের নির্জনতায় শীতল হচ্ছে।

একজন পুরুষ আকাঙ্ক্ষার অন্ধকার গহ্বর থেকে বের হয়ে সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপ সহ্য করতে না পেরে নারীর কাছে সকরুণ দাবি করল—আমাকে কিছু দাও।

একজন নারী নির্জন তপস্যায় নিয়ত নিমগ্ন মন সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপকে সহ্য করে পুরুষের দিকে নির্নিমিখ বিস্ময় ঘূর্ণিত ফুলের পাঁপড়ির মতো চোখ খুলে দিয়ে প্রশ্ন করে—কি চাও তুমি ?

আজকে এই প্রথম নির্মল বুঝতে পারল এক নিভৃত গোপন বেদনা এবং প্রবল নির্জনতাকে প্রথম অনুভব করে হাঁটতে থাকে।

ক্রমে ক্রমে ক্রমে গোধূলির আকাশে হাল্কা অন্ধকার নেমে এসে স্থানটিকে সুধাস্নিগ্ধ করে তুললো। গঙ্গা তখন বালিকার চঞ্চলতাটুকু নিয়ে মৃদু নিঃস্বনে বইছে। নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা কালে শ্রেণীহীন পাখীদের অপ্রতিহত অভিসার। কাকগুলো আশ্চর্য্য রকম ভাবে স্তব্ধ হয়ে ঠোঁট নাড়ছে ডানায়। পঞ্চবটের নিকটে গঙ্গার ধারে শান বাঁধানো বসবার জায়গায় নরেশ চক্রবর্তী বাবলুকে জড়িয়ে ধরে বসেছিল। গঙ্গার বিশাল বুকে ছড়িয়ে দেওয়া বাবলুর চোখ

ছুটো নিষ্প্রভ যেন সন্ধ্যার ছায়া। জড়িত কণ্ঠে বাবলু বললে—চলুন কাকা মন্দিরে যাই।

নরেশবাবু নিরুত্তর, যেন স্থির পাথরের মূর্তি স্নায়ুহীন অস্তিত্ব। হৃদয়ে উত্তাপ নেই। মনে উদ্বেগ নেই।

বাবলু নড়ে উঠে বললে আবার—চলুন কাকা মন্দিরে যাই।

নরেশবাবু বুঝতে পারলেন এবং বললেন—অনেকক্ষণ বসেছিলাম। তোমার খারাপ লাগছিল। তাই না? চল এবার উঠি। তোমার মা আবার চিন্তা করবেন।

বাবলু নরেশবাবুর হাত থেকে নিজের হাতকে মুক্ত করে বললে —মন্দিরটা ঘুরে বাড়ি যাব।

নরেশ চক্রবর্তী বুঝতে পারেন, ঈশ্বরের প্রতি বাবলুর আকর্ষণ দিন দিন প্রবল হচ্ছে। ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষণ বর্ধিত করবার জন্য নরেশবাবুর অসীম চেষ্টা অনস্বীকার্য। নরেশ চক্রবর্তী বাবলুর হাত ধরে বললে—কালীভক্তির ভেতর দিয়ে জেগে ওঠে শক্তিনির্ভর অতি সুন্দর দিব্যভাব। শুধু তাই নয় স্থূল ইন্দ্রিয়বিক্ষোভ প্রশমিত করে। বাবলু নির্বাক হয়ে শোনে। কিছু বোঝে, কিছু বোঝেনা। কিন্তু নরেশ চক্রবর্তীর কথাগুলো শুনতে ভাল লাগে। বাবলুর ষোল বছর বয়সে অনেক কিছু শিখিয়েছেন নরেশ চক্রবর্তী।

নরেশ চক্রবর্তী আবার বলেন—দিব্য ভাব এলেই মানুষ সংসারের যাবতীয় সুখদুঃখ ভুলে মানুষের সীমা পেরবার চেষ্টা করে।

বাবলু মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে ইচ্ছামত। বাবলুর প্রশ্ন—সীমা কি? নরেশ চক্রবর্তী বুঝিয়ে দেন—সংসারকে কেন্দ্র করে মানুষের যে মন স্বার্থে, সংকীর্ণতায়, দুর্বলতায় আবদ্ধ, লোভের দ্বারা, মিথ্যার দ্বারা, অসংযমের দ্বারা, অহংকারের দ্বারা পরিচালিত তাই সীমা।

বাবলু এবং নরেশ চক্রবর্তী কালী মন্দিরে এলেন। নরেশ

চক্রবর্তী বাবলুকে কালী মূর্ত্তির চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে বলেন। বাবলু পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকে। চোখ ভিজে ওঠে। বাবলু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

নরেশ চক্রবর্তী গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করেন—ঐ মূর্তিটাই মা নয় বাবলু। ঐ মূর্তিটার ভেতর মায়ের স্বরূপ আছে। মা যে একটা মাটির প্রতিমূর্তি এ কথা কখনই ভাববে না। মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ মায়ের স্বরূপকেই এই মূর্তির ভিতর দেখেছিলেন। তাই বিবেকানন্দকে তিনি স্পষ্ট বলতে পেরেছিলেন, হ্যাঁ আমি ঈশ্বর দেখেছি।

বাবলুর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। অস্পষ্ট হয়ে উঠছে কালী মূর্তি। বাবলু এবং নরেশ চক্রবর্তী মায়ের মন্দির থেকে নেমে এলেন। ক্রমশ ভীড় বেড়ে উঠছে। এখনি আরতি হবে। সবাই জোড়হাত বুকের মাঝে রেখে দাঁড়িয়ে থাকবে প্রার্থনার ভঙ্গিমায়। অনেকে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। যুবক যুবতীদের বিলাসী শরীর-গুলো ভোগের নেশায় মত্ত। ওরা অনেকে হাত ধরে চলছে। কেউ হাসছে বা কেউ গা ঘেষে চলেছে। যৌবনের উগ্র গন্ধে কামনায় জ্বলতে জ্বলতে দ্বাদশ শিব মন্দিরের সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে সীমিতস্তনী এবং মাংসল দেহী যুবতীর হাত যুবক মুঠের মধ্যে রেখে গল্প করছে, হাসছে হাসছে হাসছে। আর এক বিবাহিত যুবতী আর্তস্বরে বিলাপ করছে, মা মা আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও। ফিরিয়ে দাও। ফিরিয়ে দাও। যে যার দাবী নিয়ে এসেছে মায়ের কাছে। কিন্তু মায়ের দাবী কেউ শুনছে না।

নরেশ চক্রবর্তী দ্বাদশ শিবমন্দিরে উঠে বললেন—এইগুলোকে বলে দ্বাদশ শিবের মন্দির। শিবেই নিহিত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের বীজ। নরেশবাবু শিবের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করলেন বাবলুর কাছে। তারপর এলেন রামকৃষ্ণদেবের ঘরে। দিন দিন এই ঘর রামকৃষ্ণ ঠাকুরের স্মৃতির প্রদর্শনীর ঘর হয়ে উঠছে। এতেই প্রমানিত,

মহাপুরুষ রামকৃষ্ণদেবের অমর আত্মা বিস্মৃত হচ্ছে।

বাবলু প্রশ্ন করল—কাকা এখানে যারা আসে, সবাই কি ভগবানের করুণা লাভের জন্য আসেন ?

নরেশ চক্রবর্তী উত্তর দেন—বিভিন্ন মন নিয়ে ওরা করুণা লাভের জন্যই আসে। চেয়ে দেখ যুবক যুবতীরা চলছে কলহাস্যে, ঐ দেখ ভীড়ে ওরা কিরকম চঞ্চল হয়ে উঠছে। আবার এর ভেতর আছে অনেক মাতা, কুমারী, বধূ। যদি খুঁজে দেখ এখানে পাবে সমাজচ্যুত নারী, ভণ্ড, সাধুবেশী ধর্ম ব্যবসায়ী। ভাল করে চেয়ে দেখ বাবলু, এখানে আসছে অন্ধ আতুর পঙ্গু, খঞ্জ জরা জর্জর বৃদ্ধ বৃদ্ধা। ধনী গরিবের সমাবেশ ঘটছে এই মন্দিরে। এটা ঠিক, সবাই মায়ের আশীর্বাদ গ্রহণ করতে এসেছে। কেউ জীবনের সকল উদ্দেশ্য ত্যাগ করে শুধু মায়ের করুনা চাইছে। আবার অনেকে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মায়ের করুনা চাইছে।

বাবলু বললো—এ ভাবে কেন আমারা নিজেরাই নিজেদেরকে প্রতারণা করছি !

নরেশবাবু উত্তর দিলেন—আমরা যখন আবার বুঝতে শিখব আমরা এক ব্রহ্মার সন্তান। দেবতা, মানুষ, অসুর সকলকেই ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছেন। দেবতাকে শিক্ষা দিলেন দমন করতে, মানুষকে বললেন দান করতে, পশু শক্তিকে বললেন দয়া করতে। আসলে আমাদের মধ্যে দেবতা মানুষ অসুর এই তিনের সমাবেশ ঘটেছে।

নরেশ চক্রবর্তী বাবলুর হাতকে মুঠোর ভিতর পুরে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন গঙ্গার তীরে। আকাশের দিকে হাত তুলে বললেন—ঐ আকাশে যখন মেঘ ডাকে মেঘের মধ্যে শুনতে পাবে সেই মহান ঋষির উচ্চারণ—তদেতৎ এয়ং শিক্ষেৎ দমং দানং দয়ামিতি। এবং প্রজাপতির বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠবে বিদ্যু চমকে, দম্যত ! দত্ত ! দয়ধ্বম !

অবশেষে বাবলু বললে—কাকা চলুন বাড়ি ফিরি। অনেক রাত হল। মা হয়তো ভাবছেন।

সময়ের গতি বৌবাজারের নারী-হাটে এসে মুখ থুবড়ে পরে আছে পচা গরুর মত। রাত গড়িয়ে যায় নিশাচর মাতালের ঢঙে। যদিও পরেশের হাতে ঘড়ি পৃথিবীর মতো টিক্ টিক্ শব্দে চলছে তথাপি পরেশ গণিকার ঘরের দর্পণে নিজের চোখ দেখবার চেষ্টায় দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে। সস্তা কাঠের আলমারীর গায়ে আঁটা এক মানুষী আয়না। দ্বিগুণ খাট, পরিচ্ছন্ন। মনে হয় না এখানে কেউ আগে শুয়ে গেছে। ষাট পাওয়ারের ডুম দশ বাই বার ঘরের ভেতরে জিনিষপত্তরকে স্পষ্ট করে। খাটের নিচে অন্ধকার। সেখানে টিনের স্যুটকেস। রঙ ওঠা স্যুটকেসের উপর একটি গোলাপ। কোনও একসময়ে আরও স্পষ্ট ছিল। সায়া, শাড়ি, চেলি ভর্ত্তি আলনার পাশে দরজা। আলনার পিছনে কয়েকটি এনামেলের থালাবাসন। একটি ছোট্ট সরষে তেলের শিশি।

কি গো নাগর দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?—এক বালতি জল ঘরে এনে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল চাঁপা রাণী দাসী। এ ঘরের মালিক।

চাঁপা পরেশের কাঁধে হাত রেখে বললে—অনেক মাস পরে এলে। কেন ? কেউ বুঝি মন বেঁধেছে। তা যাই বল, অনেক গল্প জমা হয়ে আছে।

দর্পণে পরেশ নিজের চোখে প্রতিবিম্ব খুঁজবার জন্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্যাণ্টের পকেটে হাত। ঠোঁটের ডান ধারে সিগারেট পুড়ছে। চাঁপা পরেশকে ঠেলে দিয়ে বললে—কথা বলছ না কেন ? মদ না খেয়েই মদের নেশায় ডুবে আছ।

চাঁপা বিছানায় বসল।

বললে—দুদিন আগেই একটা লোক এসেছিল আমার ঘরে হাবার মতো আমার দিকে তাকিয়ে বললে—না তুই আমার বৌ না। আমি কড়া করে শুনিয়ে দিলাম, পাগলামো এখানে চলবে না। টাকা বের কর। লোকটা, বুঝলে নাগর, আমার দিকে তাকিয়ে বললে, অনেকটা তোর মত আমার বৌটা বটে। সেই যে পালিয়ে গেল, আর এল না আমার কাছে। কেউ বলে বেশ্যা হয়েছে। কেউ বলে আত্মহত্যা করেছে। কেউ বলে অন্য লোকের সাথে ঘর করছে। জানিস্ এবার যদি বৌকে পাই আর কোনদিন ওর গায়ে হাত তুলব না। আমি আবার বললাম রেগে গিয়ে, ফের যদি পাগলামো কর ঘর থেকে ঘাড় ধরে বের করে দেব। এর পরেই বুঝলে নাগর—

দর্পণে পরেশ দেখল—চাঁপার পান খাওয়া হাসি বন্ধ হয়ে গেছে। কয়েকটি দাঁতের গোড়ায় কালো ছাপের ঘৃণা মুছে গেল। চাঁপার চোখ দুটো বুজে আসছে। বিছানার উপর দিয়ে চাঁপার লম্বা ছায়া দেয়ালে আর নড়ছে না। পরেশ চাঁপার দিকে মুখ করে অবাককণ্ঠে বললে—এরপর কি হল।

চাঁপা হঠাৎ উচ্চস্বরে হাসতে লাগল। চাঁপার হাসি কাঁচের টুকরো মতো ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে বিছানায়। আবার উঠছে। আবার হাসছে। পরেশের হাত ধরে টান দিল। পরেশ হুমরী খেয়ে চাপার গায়ে পড়ল।

পরেশ নিজেকে সামলিয়ে এনে দর্পণের সম্মুখে নিজেকে প্রতি-ষ্ঠিত করে গম্ভীর কণ্ঠে বললে—গল্পটা শেষ কর।

চাঁপা হাসতে হাসতে বললে—ঐ লোকটা শুনল, আমি শুনলাম, কে যেন বলছে, বাবা চলে এসো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে? লোকটা দরজা খুলে বের হয়ে যেতে যেতে বললে, আমার ছেলে। বৌ এই ছেলেকে ফেলে চলে গেছে, ছেলের বায়না মাকে খুঁজে বের করতে হবে। তাই তো রোজ খুঁজতে বের হই। চিরকাল খুঁজতেই থাকব।

চাঁপা বললে—আমিও ছাড়বার মাগী নই, পাঁচটি টাকা আদায় করে নিয়েছি ঐ লোকটার কাছ থেকে। দর্পণে অনেক চেষ্টায় পরেশ নিজের চোখ খুঁজে পেল। দর্পণের অতি কাছে গিয়ে দেখল শৈত্যে চোখের তারায পরেশ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। চোখের কালো-বিন্দুতে পরেশের সমূর্তি কত ক্ষুদ্র অথচ কত সজীব।

চাঁপা বললে—টাকা বের কর নাগর। অনেক মাস পরে এলে বেশি করে টাকা এনেছ ত।—চাঁপা শাড়ি খুলে ফেলল। হাত পাতল পরেশের কাছে। যাট পাওযাবের ডুম নিভিয়ে দেয়। সবুজ আলো জ্বলল। পরেশ দ্রুত দরজার কাছে গেল। দরজার ছিটকিরি খুলে ফেলল।

চাঁপা অবাক হয়ে বললে—কোথায় চললে।

পরেশ ঘরে থেকে বের হতে যাবে সে সময় চাঁপা জামা ধরে বললে—যাবে, যাও। অনেক সময নষ্ট করেছো টাকা দিয়ে যাও।

পরেশ বুক পকেট থেকে দশটাকার নোট বের করে চাঁপার হাতে দিয়ে ঘর থেকে বের হতেই কপালে ঠেকল টিয়াপাখীর খাঁচা। খাঁচাটা প্রচণ্ড ভাবে দুলতে থাকলো। টিযা পাখী চিঁচিঁ শব্দে ডাকতে সুরু করল। পাখীর শব্দ সেই স্তব্ধ বাতাসে আটকা পড়ে ঘনীভূত হল। পরেশ কপালের ক্ষতে হাত চাপা দিয়ে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় নেমে এল।

পথে দেখল, নরকের প্রহরী পুলিশের মোহাবিষ্ট অতন্দ্র চোখ।

পরেশ পথ চলতে সুরু করে। আলোর পথ পেরোয়, অন্ধকার। অন্ধকারের পথ পেরোয়, আলো। কিন্তু পথ চলা থেমে নেই। মাঝে শুধু একটু বিশ্রাম। এই বিশুদ্ধ রাত্রির গহনে কলঙ্কিত পৃথিবীর ভার ঝরে যায় নিঃসঙ্গ আঁধারে, এই নির্জন বিস্তৃত গড়েরমাঠে।

অন্ধকারে উন্মুক্ত হাওয়ায় জীবনের প্রোজ্জ্বল ক্লেদ সদর্পে আত্ম-সমর্পণ করল। বহুদিন হাওয়ার স্পর্শ না পেয়ে পরেশ স্থির করে-ছিল বিলাসী জীবনে বাতাসের প্রয়োজন নেই। এখন পরেশ স্থির

করল অন্ধকারেই আছে আলোর স্পর্শ। আলোতে আছে অন্ধকারের ইসারা। আজ যদি সারারাত গড়ের মাঠে বিশাল গাছের নিচে পরেশ শুয়ে থাকে ; কাল এই অন্ধকার দূর হয়ে যাবে।

যদিও পরেশ বুঝতে পারে অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু অনুভব করতে পারা যায়। অনুভব শক্তি লুপ্ত হলে মানুষের মন অন্ধকার হয়ে যায়। সে সময় মানুষের চিন্তার মৃত্যু ঘটে। এরকম চিন্তা পরেশকে বিষণ্ণ করে। পরেশ ভয় পায়। নির্মল অন্ধকারে এবং রূপদক্ষ রাত্রির নির্জনে জন্ম গ্রহণ করে সবুজ স্মৃতি, ঈশ্বর, মাতৃ-স্নেহ। সুস্থ মানবিকতার পাত্রে শুদ্ধ প্রতিভা। আঃ, আশ্চর্য্য বাতাসের গায়ে হাস্নুহানার স্বপ্ন। জরাগ্রস্ত বুড়ির মত বুকে অদম্য বিশ্বাস নিয়ে পরেশ নিকটবর্তী ভয়কে অতিক্রম করে। বরং পরেশ ভাবে, আমরা অন্ধকারেই থাকবো, চলবো বলিষ্ঠ অনুভব, দিব্য-স্মৃতি, পবিত্র চিন্তাকে আশ্রয় করে। তমসো মা জ্যোতির্গময় প্রাচীন ঋদ্ধ বাণী উচ্চারিত দুবলদের জন্য। এ ঋদ্ধ বাণী কাপুরুষদের মনের সম্পদ। অসহায়দের সহায়। গড়েরমাঠ এবং ঘনীভূত অন্ধকারের নির্জনতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে মনে গভীর অন্ধকারের প্রতি অসীম আশ্বাস রেখে পরেশ এগিয়ে যেতে লাগল আবার। চাঁপার লাল লাল হাসি, সবুজ আলোয় দৈহিক কামনার দুর্গন্ধময় গুপ্ত যন্ত্রণা যেন মৃতার মসৃণ বলিষ্ঠ দেহের উপর বলাৎকারের ঠাণ্ডা আনন্দ, খাঁচায় টিঁয়া পাখীর নিরব করুণ ভঙ্গী পবিত্র নির্মল অন্ধকারে ডুবে যেতে দেখল পরেশ। কখন এল ঢাকুরিয়ায় পরেশ বুঝতে পারল না। বুঝতে পারল মাথায় তীব্র যন্ত্রণা। চোখ দুটো জ্বালা করছে। হাত পা টন্ টন্ করছে। কোমরে মৃদু ব্যথা। হৃদয় শীতল। শরীর উত্তপ্ত। পরেশ বাড়ির দরজায় কড়া নেড়ে শব্দ সৃষ্টি করল। অনেক-ক্ষণ দাঁড়াল। অনেকক্ষণ পর হাত ঘড়ির দিকে তাকাল। দশটা বেজে চল্লিশ। পরেশ মনে করতে পারল না গড়েরমাঠে কতক্ষণ শুয়েছিল। আবার কড়া নাড়ল। এবার দরজা খুলে গেল।

পরেশ বুঝতে পারল সামনে মা। মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখল, মা, মাতৃস্নেহ, মাতৃ আশ্রয়। নিঃস্বার্থ, মুক্ত, স্বাধীন। পরেশ ডাক্‌ল—মা।

হঠাৎ বাইরের বাতাস শিশির ভেজার মতো নরম ডাকটাকে চট্ করে সরিয়ে নিয়ে গেল। পরেশের মা শুনতে পেলেন না।

তিনি বললেন—প্রায়ই এত রাত করে ফিরিস্ কেন ? ছুটি ত হয় নয়টায়। চেহারার কি ছিরি হয়েছে আয়না দিয়ে একবার দেখিস্।

পরেশ বললে—বিছানাটা পেতে দাও। কিছু খাব না। আমার জ্বর আসছে।

পরেশের মা চম্‌কে গেলেন না। দরজা বন্ধ করে দিয়ে পরেশকে ধরে নিয়ে গেলেন পরেশের ঘরে। বিছানা পাতাই ছিল। পরেশকে সযত্নে শুইয়ে দিলেন। কোন কথা না বলে অন্য ঘরে চলে গেলেন। একটা চাদর এবং থার্মমিটার নিয়ে আসতে হবে। কারণ পুত্র অসুস্থ, সুস্থ করে তুলতে হবে যে।

চার

বিকেলের কামলারোদের শেষবিন্দু বুকেহেঁটে চুপে চুপে মানিক-তলার মুন্সিপাড়া লেনে শ্যামলের মাটির ঘরে কাঠের জানলা দিয়ে ঢুকল। একটু একটু করে তক্তপোষ বেঁয়ে উপরের দিকে উঠতে উঠতে অবশেষে আলতো করে শ্যামলের প্লাষ্টারের পায়ের কাছে এসে স্থির হয়ে রইল। ঠিক তখনই, সূর্য্যের শেষরশ্মীর স্পর্শ পেলে, শ্যামল তার গলাব স্বরকে যথাসম্ভব ক্ষীণতম থেকে ক্ষীন করে বলে—মঙ্গল মঙ্গল।

হয়তো মঙ্গল ঘরে নেই, বাইরে খেলতে গেছে। কিম্বা অবেলায় ঘুমুচ্ছে, ডাকবার লোক নেই। নতুবা কাজে ব্যস্ত, কিছু কিনতে বাইরে গেছে। যদি মঙ্গল না আসে এবং যদি রোদটা চলি চলি ভাব দেখায় তখন শ্যামল আরও অস্থির হয়ে পড়ে। তক্তপোষ থেকে নামতে চেষ্টা করে এবং দেয়াল ধরে ধরে একফালি বরফ দেওয়া মাছের মত মরা পচা সিমেণ্টের বারান্দায় বসতে ইচ্ছে করে। সে সময় গলার স্বরকে পূবের তুলনায় যথাসম্ভব উচ্চে তুলে ডাকে—মঙ্গল মঙ্গল।

শ্যামল হাঁপায়। দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলে। শ্যামল দুর্বল এখনও। তখন কোথা থেকে তেরবছরের একটি কালো রোগা ছেলে এসে হাজির হয়। বেশ একটু ত্রস্তপদে আসে। তারপর ধীরে ধীরে অসুস্থ পাটা তক্তপোষ থেকে নামিয়ে মাটিতে বসিয়ে দেয় এবং শীর্ণ হাত দুটো ধরে শ্যামলকে দাঁড় করাতে চেষ্টা করে। অবশেষে শ্যামল দেয়াল এবং মঙ্গলের সাহায্যে দুবল শরীরটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে রক্তশূন্য বারান্দায়। ওখানে একটা আরাম কেদারা খোলা থাকে। শ্যামল সেখানে বসে। অন্য একটা টুলের উপর প্লাষ্টারের পাটা সটান করে রাখে। বকের ডানার মত সাদা চোখদুটো আকাশের দিকে তুলে ধরে নির্লিপ্ত হয়ে আরও একবার শ্যামল ডাকল—মঙ্গল।

মঙ্গল শ্যামলের কাছে এল।

টিনের ফাঁক দিয়ে, বেড়ার ফাঁক দিয়ে এবং টালির ছাদের ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া উঠছে উপরের দিকে, বড্ড ধীরে ধীরে। অনেক দূরে উঠতে হবে সেই আকাশে। সামান্য একটু আকাশ ঘসা-কাচের মত, অমলের চোখে স্থির। আমগাছের ডালে একটি কাক তখনও। চুপ।

নির্লিপ্ত, অথচ অস্থির। গম্ভীর, অথচ অশান্ত অমল বলে—তোর দিদিমণি এখনও আসছে না কেন মঙ্গল ?

মঙ্গল জানে, সন্ধ্যার পর দিদিমণি আসে। সে সময় অনেক ঘর থেকে শঙ্খধ্বনি হয়। নিত্য কাসর ঘণ্টা বাজে পেছনের দালান বাড়িটা থেকে।

সন্ধ্যা এখনও হয় নি, যদিও অমলের বারান্দায় সন্ধ্যার ছায়া তবু মঙ্গল বলে—এখুনি এসে পড়বে। আমি উনোন ধরাব আর দিদিমণি এসে যাবে।

শ্যামল কথা বলে—তোকে আজ উনোন ধরাতে হবে না। বাইরে যা, দেখ দিদিমণি আসছে কি না। যতক্ষণ দিদিমণি না আসে, শ্যামল শুধু ভাবে।

আলো এমন করে আমার কাছে আত্মসমর্পণ কেন করল। আর আমিই বা আলোকে ছাড়া বাঁচবো না কেন ? অথচ মল্লিকা সুনন্দার কাছে আমি স্বকীয় পৌরুষকে উৎসর্গ করেছিলাম। মৃত্যুঞ্জয় ব্যঙ্গ করে বলতো মনের নগ্ন প্রকাশ। এখন বুঝি, মৃত্যুঞ্জয় দিলীপ এরা মল্লিকা-সুনন্দার সাথে আমার ইচ্ছাকৃত আলাপকে হিংসা করত। কারণ মল্লিকা সুনন্দার স্বাস্থ্য আছে, বিলাসিতা আছে। শিক্ষা ক'চ উপরন্তু রূপের আকর্ষণ। এখন বুঝি, আমার মত একটি সরল (ওরা ভাবে সরল অর্থ বোকা, আশ্চর্য ওদের চিন্তার প্রাখর্য)

অবিলাসী যুবক কেন মল্লিকা সুনন্দার সাথে মিশবে। এখন বুঝি, দেহের নগ্নতা আগুনের সৃষ্টি করে, অতি ভাবনায় ব্যর্থতাজনিত মনের মৃত্যু। মনের নগ্নতা অর্থাৎ প্রকাশ সত্য মানুষ করে, অতি ভাবনায় আধ্যাত্মিকতা। আমাদের এই তো প্রয়োজন, কর্ম্ম দিয়ে জয় করবো সংসারকে, আমার ভাগ্যকে। মন দিয়ে জয় করবো মানুষের ভালবাসাকে, আমার সফলতাকে।

তবু শ্যামলের মনে হয় ভাঙ্গা পায়ের কথা। তখন দুঃখ হয়। দুঃখে মন আতুর হয়। জীবন চলতে পারে না।

ভাবে, কর্ম দিয়ে সে সংসারকে জয় করতে সক্ষম হবে না। আবার আলোর মুখের দিকে তাকালেই সকল দুঃখ অদৃশ্য হয়ে যায়। সে সময় কর্ম এবং ভালবাসা জীবনের এ দুটি পথ ছাড়া সে আর কিছু দেখতে পায় না।

বস্তিতে বেজে ওঠে শঙ্খের আওয়াজ। পেছনের দালান বাড়িটা থেকে কাঁসর ঘণ্টার শব্দ। শ্যামল শোনে। জাবনের কোন খানে লুকিয়ে আছে একটি অব্যক্ত যন্ত্রণা এ সময় শ্যামল সেই যন্ত্রণাকে খুঁজে পায় না।

আরাম কেদারার উপরের দিকে দুটো হাত তুলে শ্যামল ডাকে—দেখতো মঙ্গল তোর দিদিমণি আসছে কি না?

মঙ্গল রান্না ঘরে।

রান্নঘর থেকে উত্তর দেয়—যাচ্ছি দাদাবাবু।

শ্যামল ভাবে।

মৃত্যুঞ্জয় বলতো—শ্যামল একটা নাম্বার ওয়ান অপদার্থ। ও কিনা যাচ্ছে ধনীদুহিতা মল্লিকা মল্লিকের কাছে প্রেম নিবেদন করতে। দেখ শ্যামল, স্বীকার করি তুই স্কলার ষ্টুডেন্ট, কিন্তু সস্তাদামের তাঁতের পাঞ্জাবী আর হাতিবাগানের পাজামা চটি নিয়ে মল্লিকার কাছে যাসনে প্রেমের কাঙাল হয়ে। সুনন্দা বলতো—বড্ড মিশুকে

আমাদের শ্যামল। সত্যি আদর্শবান ছেলে। বেশি কথা বলে না। কথা শোনে আর হাসে। জীবনে উন্নতি করতে না পারলেও সুখে থাকবে।

এই সুনন্দাকে নিয়ে শ্যামল একদিন গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়েছিল। নির্জন স্থান খুঁজে নিয়ে বলেছিল—জানো সুনন্দা, আমি অনেকদিন ধরে একটি মন খুঁজে চলছি। মায়ের স্নেহ কোনদিন বুঝতে পারিনি। আমার বয়স তখন চোদ্দ, মা মারা গেছেন। এর আগেই দুই দিদির বিয়ে হয়ে গেছে, ওদেরও ভালবাসা পেলাম না। তারপর বাবাও মারা গেলেন। কলকাতায় বন্ধু বান্ধবীর কাছ থেকে নিঃস্বার্থ ভালবাসা পাচ্ছি না। একটা ভারি পর্দা দিয়ে যেন ভালবাসা ঢাকা পড়ে আছে। মিথ্যার আশ্রয়ে না থেকে বলছি একটি বলিষ্ঠ মনের জন্য অনেক মেয়ের সাথে ঘুরেছি। আমার জীবনকে উৎসর্গ করবার জন্য, কর্মে বিশ্বাসে ভালবাসায়। আমি যেন দিন দিন অস্থির হয়ে উঠছি। পেলাম না। কেউ আমাকে ভালবাসা দিল না। সুনন্দা, তুমি আমাকে ভালবাসতে পার না?

সেদিন সুনন্দা বলেছিল—শ্যামল তোমাকে নিয়ে একটা সুন্দর স্বপ্ন গড়ে তোলা যায়। ব্যস্ ঐ পর্য্যন্তই, এর বেশি তুমি কোন কাজে আসতে পার না।

দীপংকর বলতো—শ্যামল একদিন আত্মহত্যা করবে। এত স্বার্থপর আর কৃপণ হলে কি প্রেম চলে। খরচ করতে হয়। পয়সার মুরদ নেই, আবার প্রেম।

অথচ শ্যামল সবই বুঝত। তবু বলত না, আমি স্বার্থপর নই, আমি কৃপণ নই। আমার মা নেই, বাবা নেই। কোন দ্রাঘিমায় আমার দেশ আমি তা জানি না। আমি একা, নিঃসঙ্গ। আমাকে নির্ম্মম নিষ্ঠুর কলুষ যুগের সাথে লড়াই করে চলতে হচ্ছে। কেন তোমরা সেটাকে স্বার্থপর বল, কৃপণ বল।

এর পরের ঘটনা হাসপাতাল।

এবং এরপর হতে কয়েকটি যুবক যুবতীর চরিত্র স্পষ্ট হয়ে যায়, যথা—দীপংকর, মৃত্যুঞ্জয়, দিলীপ, মল্লিকা ও সুনন্দা অর্থাৎ এরা কেউ আসেনি হাসপাতালে শ্যামলের কাছে। রাস্তায় দুর্ঘটনায় আহত শ্যামলকে সান্ত্বনা দিতে।

অথচ

শ্যামলের একটি আকাঙ্ক্ষাব বিকেল অন্তঃসত্ত্বা বিশ্বের যন্ত্রণায় কাতর হল। দ্বিতীয় দিনটি জীবনের ভ্রূনেই আত্মহত্যা করল। তৃতীয় দিন সূর্য্যের বিকেলের মরা আলোয় দেখল মানুষের মিছিল, চলছে মরুভূমিব উপর দিয়ে ভয়ংকর ভবিষ্যতের দিকে। তাদের ক্ষয়িষ্ণু স্নায়ুর অন্তরালে মৃত্যুর ভয়াল মুখ।

আকাশে সান্ধ্য ধোঁয়া উঠছে। শ্যামল ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। সে ধোঁয়ায় একটি নারীকে সে দেখতে পায়। শ্যামল চোখ বুজে থাকে।

সেদিন শ্যামল হাসপাতালে ঘুমোচ্ছিল।

শ্যামলের শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে আছে এক নারী। দেখছে শ্যামলকে। এক গাল দাঁড়ি নিয়ে অন্ধকার আকাশে উজ্জ্বল তারার মতো ঘুমোচ্ছে। মৃত যুবকের ভূমিকায় গালবসা চোখবসা মুখ। গভীর কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে চাইছিল বলিষ্ঠ নারীর কোমল মন। ছলছল চোখ দুটোকে বন্ধ করে চাপা দিতেই কয়েক ফোটা জল বের হয়ে এল নারীর চোখ থেকে।

নার্স এল কাছে। হাতে থার্মোমিটার।

নারীকে প্রশ্ন করে—অপনিই প্রথম এলেন। আর কেউ আসে নি। প্রথম প্রথম শিশুর মতো কাঁদতেন।

আমি বলতাম—দেখবেন আসবে। ঠিক কেউ আসবে।

কান্না ভেজা গলায় তিনি বলতেন, কেউ আসবে না সিষ্টার।

আমার কেউ নেই।

নারী ঠোঁট কামড়ে ধরল। রুমাল দিয়ে চোখ মুছল।

নার্স ডাকল—শ্যামলবাবু, উঠুন! বিকেল হয়েছে।

শ্যামল চোখ খুলল। চোখ দুটো ঘুরিয়ে সিস্টারকে দেখল। সিস্টারকে দেখতে গিয়ে দেখতে পেল মাথার শিয়রে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। যুবক ক্ষীণস্বরে বললে—সিস্টার কে ওখানে দাঁড়িয়ে।

নার্স শ্যামলের মুখে থার্মোমিটার দিতে গিয়ে উত্তর দিল—আপনার কাছে এসেছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। আপনি সে সময় ঘুমোচ্ছিলেন।

মুখে থার্মোমিটার নিয়ে নিথর হয়ে পড়ে রইল কতক্ষণ। হৃদয় কাঁপছে।

নার্স থার্মোমিটার তুলে নিয়ে চলে গেল

শ্যামল ডাকল—কে? সুনন্দা? এদিকে এসো। তোমাকে তো দেখতে পাচ্ছি নে। কথা বলছো না কেন? তবে কি মল্লিকা? আমি যে উঠতে পাচ্ছি না। বড় দুর্বল। কাছে এসো।

বিছানার ধারে এসে দাঁড়াল শান্ত নারী। সলাজ স্থির চোখে নির্ভয়ে নির্ভর চিত্তে বললে নারী—আমি সুনন্দা বা মল্লিকা নই। আমাকে চিনতে পারছেন না?

শ্যামল শোওয়া অবস্থায় থেকে নিজের বিছানার ধারে একটি জায়গায় চাপর দিয়ে বললে—এখানটায় বসুন। কেন আপনাকে চিনতে পারবো না। আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে টিউটোরিয়াল ক্লাসে আপনি আমাদের ভিতর একবার বেশি নম্বর পেলেন।

শ্যামল চুপ করে থেকে নিশ্বাস টেনে নিল। পাশের বেড-এ মহিলা তার অসুস্থ স্বামীর হাত ধরে। তাদের ফিসফাস কথার শব্দ। কিছুদূরে একজন বৃদ্ধ রোগীর প্রলাপের তীব্র উচ্চারণ। ওর মাথার শিয়রে কেও নেই।

শ্যামল আবার বলে—মল্লিকা সুনন্দা দীপংকর মৃত্যুঞ্জয় ওরা প্রায়ই আপনাকে বলতো, দেখ কি বিশ্রী সেজে এসেছে আজ, অশ্লীল নোংরা। মল্লিকা হঠাৎ বলে উঠল, মেনকা রম্ভা ওদেরকেও হার মানিয়েছে। তা শুনে মৃত্যুঞ্জয় বলেই ফেললো, প্রগতির দোহাই দিয়ে গণিকার ভূমিকায় অবতীর্ণা। ওর কথা শুনে আমরা সবাই মিলে হাসতে সুরু করি। বিশ্বাস করুন আমি হেসেছিলাম। এই কথাগুলো বলে শ্যামল হাঁপিয়ে উঠল। কথার শেষে গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর আবার বলে—আপনি কেন এলেন? আপনি এসে ভুল করেছেন। জানেন এ পর্য্যন্ত মল্লিকা সুনন্দা দীপংকর মৃত্যুঞ্জয় কেউ আমাকে দেখতে এলো না। আপনি কেন এলেন আমাকে যন্ত্রণা দিতে। দেহের যন্ত্রণায় হাসপাতাল আছে, কিন্তু মনের যন্ত্রণায় হাসপাতাল নেই। আপনাকে বিদ্রূপ করায় আমিও যে সেদিন ওদের সাথে হেসেছিলাম। বিশ্বাস করুন আমি আপনাকে মোটেই ঘৃণা করতাম না। তা নাহলে ক্লাসে কি আপনাকে চুরি করে দেখতাম। মাঝে মাঝে আপনার চোখের দিকে তাকিয়েই থাকতাম। আপনি বিরক্ত বোধ করতেন কিনা জানি না দাঁত দিয়ে ঠোট চেপে ধরতেন! অথচ আপনার সাথে কোন কথা বলিনি।

নারী শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে শ্যামলের পায়ের দিকে তাকিয়ে—আপনি যে ঘৃণা করতে জানেন না সে আমি জানি। কেমন আছেন এখন! এখনও তো পায়ে প্লাষ্টার হয় নি।

শ্যামল উত্তর দেয়—এক্সরে হয়েছে। যবে খুশী করবে। কেউ তো আমার নেই যে কিছু খরচ করে তাড়াতাড়ি করাবে। আর আমি গরীব ছাত্র টিউশনি করে আর সন্ধ্যার পর হিসেবের খাতা লিখে ধনী দুহিতা মল্লিকা মল্লিকের হৃদয়ের কাছে যাই। আপনার নামটা আমার মনে পড়ছে না কেন বলুন তো। কি আশ্চর্য

দুর্ঘটনার কিছুদিন আগে ওদের মুখে আপনার নাম নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। অথচ আজ আমি মনে করতে পারছি না।

নারী যুবকের বসে যাওয়া চোখের দিকে তাকিয়ে বললে—আলো রায়।

—কোথায় থাকেন।

ঢাকুরিয়া। রায়বাগান লেন।

সান্ধ্য আকাশে প্রথম সাধ্বা তারার দিকে শ্যামলের অপলক ধ্যেয় দৃষ্টি। রক্তের তীরে অস্পষ্ট স্মৃতি আধারে বিলীয়মান, এখনই আসবে আলো। হৃদয়ের উত্তাপে জ্বালাবে শুভ্র মোম, স্নিগ্ধ এবং শুদ্ধ ভালবাসায় মুছে যাবে সর্বদা বার্ধক্য-বিষাদ। হঠাৎ চটির শব্দ শুনে শ্যামলের হৃদয় কেঁপে কেঁপে ওঠে। মঙ্গলকে দেখতে পায়। হাতে কাগজের ঠোঙা। কমলালেবুর রসে লুকিয়ে থাকে তৃপ্তির নিশ্বাস। পেছনে আলো, বিদায়ী সন্ধ্যার খণ্ড আকাশ এবং সাধ্বী তারার নিচে, যিশুই বলো অথবা বুদ্ধই বলো তাঁদের ভালবাসার অপূর্ব্ব আচ্ছাদনে আলোর শান্ত আগমন।

কেমন আছ—আলোর প্রশ্নে শ্যামলের হৃদয় আবার শুদ্ধ হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে ওঠে।

মঙ্গল ঘর থেকে একটা বেতের মোড়া নিয়ে আসে। শ্যামলের পাশে রেখে দেয়। আলো সেখানে বসে শ্যামলেয় বুকে হাত রাখে। শ্যামলের দৃষ্টিতে নিদ্রালু ঋতু, উত্তর দেয়—দিন দিন ভাল হয়ে উঠছি।

আলো কেদারার ধারে মাথা রেখে বলে—আমি যে মাঝে মাঝে দেরি করে আসি সেজন্য তোমার অসুবিধে হয় শ্যামল। তাই না? শ্যামল কণ্ঠস্বর ভিজিয়ে বলে—আমি তো জানি তুমি আসবে। দেরি

হলেও একবার আমাকে দেখে যাবে। তবু অজানিত আশঙ্কার চিন্তা। শ্যামলকে আলো—মনে কর একদিন আসতে পারলাম না।

আলোয় শ্যামল—আসবে না। বুঝবো কিছু একটা হয়েছে। তখন আমি চিন্তিত থাকবো। কিন্তু এ সকল প্রশ্ন কেন করছ আলো? মঙ্গল ঘরে মোম জ্বালিয়েছে। আলো ও শ্যামলের পেছনে শুভ্র মোমের শিখায় যেন ভোরের শিউলি ফুল আঙিনায় ছেয়ে যাওয়া পরিশুদ্ধ স্নিগ্ধ আমেজ। অন্ধকার বারান্দায় এক দরজা আলো। দরজার পাশে তরল আধারে আরাম কেদারায় শ্যামল, পাশে আলো, ওদের অস্পষ্ট দীর্ঘ ছায়া একত্রে মিশে গিয়ে রান্নাঘরেব মাটির দেয়ালে স্তব্ধ। আলো শ্যামলের প্রশ্নের উত্তর দেয়—তোমার কাছে আসার জন্য ছটফট করি।

বুকে হাত বুলিয়ে আলো বলে যায়—শ্যামল মাঝে মাঝে মনে হয় বন্ধুবান্ধব পরিবারস্বজন সবকিছু ছেড়ে সেই মুহূর্ত্তে তোমার কাছে চলে আসি। তোমার বুকে মাথা রেখে শুধু মনে হবে কেমন করে আমরা দুঃখ এবং কষ্টের ভিতর দিয়ে এই নির্মমনিষ্ঠুর পৃথিবীকে সুন্দর করে পাব। বাঁচতে খুব ভাল লাগে। তাই না শ্যামল?

শ্যামল কানের পাশ দিয়ে আলোর চুলে আঙ্গুল গুঁজে দিয়ে বলে—আমি জানি এই পৃথিবী নির্মম নিষ্ঠুর কৃত্রিম প্রতারক। কিন্তু পৃথিবীর আত্মা অতীব আনন্দময়। তাই আমি দুঃখ চাই, কষ্ট চাই যন্ত্রণা চাই। তুমি আছ বলেই চাই। তুমি না থাকলে হয়তো আমি কোনদিন পৃথিবীর আত্মার সাক্ষাৎ পেতাম না। তুমি না এলে আমি শুধু মরীচিকার পেছনে ঘুরতাম। এবং এবং কি বলা যায় বলতো এরপর। কোথায় যেন আমার চিন্তা আটকে গেছে।

আলো চিন্তাপূরণ করে দেয়—আমাকে না পেলে তুমি প্রতিযোগিতায় নেমে পড়াশোনায় উন্নতি করতে। বড়দরের অধ্যাপক বা ডি-ফিল পেয়ে বড় ঘরের মেয়েকে বধূরূপে বরণ করতে।

কষ্ট এবং দুঃখকে না বুঝে অর্থ এবং বিলাসে অর্থাৎ চরম সুখে গা ভাসিয়ে দিয়ে পৃথিবীর আনন্দময় আত্মাকে কোনদিন বুঝতে পারতে না। ধনী বধূ কোনদিন তোমার স্নেহ, মায়া ভালবাসাকে বুঝতে পারত না। অর্থকে বুঝতো চ্যালেঞ্জ একটি বিশ্রী জিনিষ। সেখানে অহংকার থাকে, হৃদয় থাকে না। এবং কি বলা যায় বলতো। কোথায় যেন আমার চিন্তা আটকে গেছে।

একটু হেসে শ্যামল চিন্তাপূরণ করে দেয়—আমার মন মরত আমার চিন্তা মরত, আমার ভালবাসা মরত অর্থাৎ এরা সবাই আত্মহত্যা করত।

এসময় মোম নিভে গেল। ঘর অন্ধকার, বারান্দা আরও অন্ধকার। গলার স্বরকে অন্ধকারের মত ঘন করে শ্যামল বলে—মোমটা বোধহয় কাচের জারে রাখা হয় নি।

শ্যামলকে আলো—তোমার অন্ধকার ভাল লাগে।

আলোয় শ্যামল—খুব ভাল লাগে। অন্ধকার তোমার মনকে, অন্তরকে স্পষ্ট দেখতে পাই।

আলো শ্যামলের বুকে মাথা রাখে। কিছুক্ষণ অন্ধকারে এবং নীরবতায় ওরা দুজনে অবস্থান করে। আলোর পিঠে শ্যামলের হাত। পিঠ বেয়ে শ্যামলের হাতের আঙ্গুলগুলো আলোর নাভির কাছে ছুঁয়ে আছে।

অন্ধকারে হাওয়ার স্পর্শের মত শ্যামল কথা বলে—

—এবার যাও। চা তৈরী করগে। আর মঙ্গলই বা কোথায় গেল? ওকে আবার উনোন ধরাতে নিষেধ করেছি।

আলো উঠল। শাড়ির আঁচলটা বুকের পাশ দিয়ে পিঠে মেলে দিল। ঘরে গিয়ে নির্দিষ্ট স্থান থেকে দেশলাই নিয়ে মোটা মোমটাকে জ্বালিয়ে দেয়। রাখে পাতলা কাঁচের জারে। শ্যামল হ্যারিকেন পছন্দ করে না। মোমের আলোয় টিন বেড়া ও মাটির

ঘরটাকে রূপময় করে তোলে, রূপকথার রাজপুত্র সুন্দরী রাজকন্যা উদ্ধার করে লুকিয়ে আছে বনের প্রান্তে নির্জন ভাঙা কুঁড়ের ভিতর। সুধাস্নিগ্ধ আলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে আলো, দেহের একদিকে আলো, অপরদিকে অন্ধকার। দীর্ঘ ছায়া, নিয়ত কম্পিত। শ্যামল সেদিকে তাকায়। শ্যামলের বিছনা পেতে দেয় আলো। উপুর হয়। শাড়ির আঁচল বুক থেকে খসে যায়।

আলো বারান্দায় আসে। বললে—ঘরে চল এবার।

টুলটা সরিয়ে নিয়ে প্লাষ্টার বাঁধা পা-টা ধরে মাটিতে বসিয়ে দেয় আলো। শ্যামল বলে আলোর কাঁধে হাত রেখে—মঙ্গল এলেই হত।

আলো রসিকতা করে—তাহলে আমার পুষ্ট স্বাস্থ্যটা আছে কি করতে।

শ্যামল অপর হাত দিয়ে দেওয়ালের সাহায্য নিয়ে বলে—কবে যে আমরা একত্রে শোব।

সযত্নে শ্যামলকে বিছানায় তুলে দিতে দিতে আলো বলে—যাঃ অসভ্য।

বেড়ার দেওয়ালে হেলান দিয়ে শ্যামল আলোর দিকে তাকিয়ে বলে—দোকানে গিয়েছিলে? দেখা হল বড় কর্তার সাথে?

আলো খাসজনতা বের করল। প্রত্যেকটিব মুখে আগুন ধরাতে ধরাতে উত্তর দেয়—তোমার চরিত্রের যা ব্যাখ্যা শুনলাম স্বয়ং বড় কর্ত্তার মুখে, মনে হচ্ছে চাকরী ছাড়ানোতো দূর কথা, চাকরীতে ফের জয়েন করবার পর হয়তো তোমাকে ফুল টাইম কাজের ব্যবস্থা করে দেবে। সন্ধ্যার পর আর খাতা লিখতে হবে না।

শ্যামল অধৈর্য হয়ে বলে—আরে দূর প্রশংসার কথা বাদ দাও।

ওরা আড়ালে অনেক কিছুই বলে, টাকা দেবার বেলায় ঐ ষাট টাকা। এই যে একমাস যাইনি প্রশংসা শুনে হয়তো ভেবেছ টাকা দেবে, কিন্তু দেবে না। আসল কথা কি বললে? বল। পা ভাল হয়ে গেলে জয়েন করতে দেবে?

ছোট ডেকচিতে জল ঢেলে খাস জনতায় বসিয়ে দেয় আলো। বলে—দেবে। আরও মাসখানেক অপেক্ষা করবে।

আলোকে শ্যামল—চা হয়েছে?

শ্যামলকে আলো—চা তো তোমার জন্য নয়, আমার। হরলিক্স তোমার।

আলো একবার মঙ্গলকে ডাকল উত্তর পেল না। আলো চট্‌পট্‌ কাজ সারতে চেষ্টা করে একাই। একবার উঠছে, যাচ্ছে বসছে। তক্তোপোষের নিচে উপুড় হয়ে ঢুকছে আবার বের হয়ে আসছে। হাতে কৌটো, বাটি, কিছু একটা। গরম জলে হরলিকস তিন চামচ ঢেলে দেয়। কিছু চিনি দিয়ে নাড়ে। কাপে চা ঢেলে ঢেকে রাখল প্লেট দিয়ে। ছোট্ট এলুমিনিয়মের ডেকচিতে জল ঢেলে দিয়ে ষ্টোভের উপর আবার সযত্নে রেখে দেয়। হরলিকস্‌ শ্যামলকে বসে থেকেই ডানহাতটা লম্বা করে দেয়। ঘরটা এত ছোট যে একটি তক্তপোষ থাকলে দুহাত প্রস্থ ও পাঁচ হাত দৈর্ঘ্য জায়গা খালি থাকে। সেই ফাঁকস্থানে বসেই আলো রান্নার কাজ করছিল।

শ্যামল: তোমার চা?

আলো: এই হচ্ছে।

শ্যামল হরলিকস্‌ চুমুক দিয়ে বললে—আজও বাড়ির ছাত্র পড়তে এলো না। ওকে বললাম ভাঙ্গা পা দেখে কামাই করা উচিৎ হবে না। তবু এল না। অথচ এ মাসের মাইনে ঠিক দিয়ে গেছে।

আলো একপো কৌটোর কিছু অল্প চাল মেপে নিয়ে ডেকচিতে ছেড়ে দিয়ে শ্যামলের কাছে এসে বসল। হাতে চা-এর কাপ।

শ্যামল : ভাল করে পড়ছ তো। অনর্থক আমার সাথে সাথে তুমি এ বছর পরীক্ষাটা দিলে না। এম, এ পরীক্ষা ড্রপ করলে পরে আর দেওয়া হয় না। আমার না হয় পা ভেঙ্গেছে।

আলো : আমি পরীক্ষা দিয়ে পাশ করি আনন্দ করি। আর তুমি মৃত্যুকে উপলব্ধি করে করে নিজের মনকে হত্যা কর। তাই না ?

শ্যামল আলোর পিঠে হাত রেখে একটু কাছে টেনে এনে বলে—পাগল, তোমাকে পাওয়ার পর থেকে জীবন সম্পর্কে আমার সকল ভয় চলে গেছে। যে কোন কাজ করতে আমি সক্ষম, সকল কাজেই সাফল্য অর্জন করতে পারব। আর আমি বিষন্ন নই ক্লান্ত নই। মাঝে মাঝে কি মনে হয় জান ? মনে হয়, কৃত্রিমতার জাল থেকে বের হয়ে এসে এই মুক্ত পৃথিবার নিচে যদি এ যুগের লোকেরা নিঃস্বার্থ ভালবাসা স্নেহ পেত, তাহলে জীবন আরও উন্নত হত। জগতের আধুনিক উন্নতি, জান আলো, যেন যান্ত্রিক উন্নতি। প্রাণ নেই। সবাই পুতুল। আশ্চর্য।

আলো নিবিড়ভাবে শ্যামলের অপ্রশস্ত বুকে মাথা রেখে শ্যামলের বুকের বোতাম খুটতে খুটতে বললে—তুমি সেরে ওঠো। তারপর দু'জনে পড়াশোনা করে পরাক্ষা দেব। দেখব কে ভাল ফল করে।

শ্যামল আলোর মাথায় থুতনি রেখে বলে—পরীক্ষার পর, পাশ করার পর কি করব আমরা ?

চোখ বুজে আলো উত্তর দেয়—কলেজে চাকরী পাই যদি অধ্যাপনা, না পাইতো শিক্ষকতা।

শ্যামল : তারপর।

আলো : তারপর বিয়ে।

শ্যামল : বিয়ের একবছর পর।

আলো : যাঃ কি যা তা বকছো।

আলো তক্তপোষ থেকে নিচে নেমে দাঁড়াল। হরলিকসের গ্লাশ আর চায়ের কাপ ধুতে গেল বারান্দায়। ধুয়ে এনে কেরোসিন কাঠের তিন থাকের সেল্‌ফে রেখে দিল।

শ্যামল দেখছে আলো কাজ করছে।

আলোর দিকে শান্ত চোখ রেখে শ্যামল কথা কয়—তোমার ত যাওয়ার সময় হয়ে এল।

আলো উত্তর দেয়—হ্যাঁ এবার উঠব। তোমায় দুধটা জ্বাল দিয়েই যাব। বাকি কাজটুকু মঙ্গল করে নেবেখন।

আলো যাবার জন্য প্রস্তুত হয়। এপাশ ওপাশ টেনে শাড়ি ব্লাউশ ঠিক করে। দুহাত দিয়ে শিথিল খোঁপা বসিয়ে দেয়। আয়নায় মুখটা দেখে নিয়ে শ্যামলের কাছে আসে। ব্যাগ থেকে দশটাকার একটি নোট বের করে নিয়ে বলে—টাকাটা তোমার কাছে রাখ। প্রয়োজন মত জিনিষ মঙ্গলকে দিয়ে কিনিয়ে নিও।

শ্যামল টাকা নিয়ে বলে—আর যে কতদিন এভাবে চলবে।

আলো উত্তর দেয়—যতদিন তোমার পা সুস্থ না হয়ে ওঠে। যতদিন না তুমি কাজ করতে সক্ষম হচ্ছ।

শ্যামল বলে—একটা কথা বলবো।

আলো সহজ হয়ে বলে—বল।

শ্যামল প্রশ্ন করে—তুমি কোথা থেকে এত টাকা সংগ্রহ কর।

আলো উত্তর দেয়—একটি টিউশানি করি।

শ্যামল একটি টিউশানিতে কি হয়। তোমারও তো খরচ আছে। তোমার বাবা নেই বলেছ।

আলো শ্যামলের অতি কাছে এসে কথা কয়—আজ থাক। আর একদিন বলবো। আমার মনেও আছে যন্ত্রণা শ্যামল। তুমি কি আজই জানতে চাও?

শ্যামল আলোকে নিবিড় ভাবে কাছে টেনে এনে বলে—আজ নয় কেন ?

আলো : তুমি যদি রাগ না কর তবে আজকেই বলতে হবে দেখছি।

আলো অলক্ষ্যে কেঁপে উঠল। শ্যামল বুঝতে পারে না। আলো যন্ত্রনা অনুভব করে। শ্যামলের হৃদয়ে মাথা রেখে নিজেকে অনেক ছোট ভাবতে থাকে। মনে হয়, সে নারীত্বকে অবমাননা করেছে। সে যেন কীটের মতো দুর্বল, অসহায়। শুধু দংশন করা সাহসটুকুই অবলম্বন। আলো কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকে শ্যামলের বুকে। শ্যামল কথা কয়—ভালবাসাকে ক্রোধ অপবিত্র করে। তোমার যেদিন খুশী আমাকে বলবে। বাবলু কি রকম পড়াশোনা করছে।

আলো উত্তর দেয়—পড়াশোনায় বাবলু ভালই। আমাদের ঘরে এক ভাড়াটে তান্ত্রিক ওর মাথাটা নষ্ট করে দিচ্ছে।

শ্যামল : তাড়াও সেই ভণ্ড তান্ত্রিককে।

আলো : পারি না। বাবার বন্ধু। তাছাড়া একটি ঘরের ভাড়া আমাদের অনেক দেয়। আমি চলি আজ।

শ্যামল আলোকে ছেড়ে দেয় নিঃশব্দে। আলো দরজার কাছে গিয়ে ফিরে আসে পুনরায় শ্যামলের কাছে। হঠাৎ শ্যামলের গাল নিজের দুহাতে ধরে শ্যামলের ঠোঁটে চুমু খেল। শ্যামল আলো-কে তীব্র ভাবে জড়িয়ে ধরে এক সময় ছেড়ে দেয়। তারপর আলো শ্যামলের পায়ের কাছে এসে পা দুটোয় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বলে—চলি। আবার কাল আসব। ভাল ভাবে থেক।

শ্যামল কোন কথা বলে না।

আলোর যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। আকাশ চোখে পড়ে। কয়েকটি তারা জ্বলছে অনুরাধা, অরুন্ধতী স্বাতী বিশাল আকাশে

স্বমহিমায় স্মৃতির নির্জনতায়, ভক্তি এবং দেহের মিশ্রণে মানবীয় সত্তায়।

রাতের ঘরেতে কেউ ছিলনা অপর্ণাদেবী এবং অমল ছাড়া। বাবলু তান্ত্রিকের কাছে পড়াশোনা করছে। রাত হয়েছে, আলো এখনও ফেরে নি, নির্জনতায় রাত্রি গম্ভীর।

অমল প্রশ্ন করে—আট্‌টা বাজল, আলো এখনও ফিরছে না?

অপর্ণাদেবী উত্তর দেন—ফিরবে। আর একটু অপেক্ষা কর। এখুনি এসে যাবে। তোমার কি তাড়া আছে?

অমল অপর্ণা দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—না, তাড়া নেই। অপর্ণাদেবী বলেন—তবে ব্যস্ত হচ্ছ কেন? একা ভাল লাগছে না বুঝি।

অমল হাসে। একমুহূর্তে অপর্ণাদেবীর সমগ্র শরীরটা দেখে নেয়। পাতলা ব্লাউজ পড়েছেন। ব্লাউজের নিচে অধুনিক ব্রেসীয়ার। অমলের দৃষ্টি মাতাল হয়। সাদা থান কাপড়টাও ফিন্‌ফিনে হালকা। অল্প বাতাসে উড়তে থাকে। মাথায় বিশাল খোঁপা। নিয়নের আলোয় গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল উজ্জ্বল। হাসিটা অমলের কাছে আগুন।

অমল কথা কয—একা লাগবে কেন? বেশতো আধঘণ্টা গল্প করে কাটিয়ে দিলাম আপনার সাথে।

অপর্ণাদেবীর বুকের কাপড় হাতের কাছে ঘসে পড়ে মাটিতে লুটোয়। উন্নত বুকের দিকে এক পলক তাকিয়ে চোখ নামাতে বাধ্য হয় অমল। কোথায় যেন সূক্ষ্ম বাঁধা। অমল বাঁধা বুঝতে পারে কিন্তু অনুমান করতে পারে না, বিশ্লেষণ করতে পারে না। অমলের তাই ইচ্ছা, আলোর মাকে সে এই মুহূর্তে প্রেম নিবেদন করবে। বলবে, তোমার হৃদয়ে আমাকে স্থান দাও। তোমার

হৃদয়ের নীতিহীন আগুনে পুড়তে চাই, আমি মরতে চাই। মৃত্যু চিন্তা আসতে অমলের মুখ মলিন হয়ে ওঠে। একবার, স্মৃতি উত্তপ্ত করে তোলে অমলকে, অমলের বন্ধুকে নীলটাই পরিহিত স্থূলকায় ডাক্তার (ডাক্তার নীল রঙ্ পছন্দ করেন। জানালার পর্দা নীল। টেবিলের কভার নীল। কোট প্যাণ্ট নীল) বলেছিলেন, এ রোগের চিকিৎসা নেই। মৃত্যু কয়েকবছরের ভিতর হবেই আপনার। ডাক্তারের কথা শুনে অমলের অর্থবান্ বন্ধুটি সেই যে পালিয়ে গেল কোথায়, আর খুঁজে পেলনা তার পরিবার স্বজন। অথচ আত্মহত্যার খবরও আসেনি।

অপর্ণাদেবী অমলের দৃষ্টিকে বুঝতে পারে। সন্ধ্যার পর অপর্ণা-দেবীর দেহে একটা বিশ্রী রস ভর করে।

অপর্ণাদেবী কথা বলেন—আমার মতো বুড়ীর সাথে তোমার কথা বলতে ভাল লাগছে না। তাই তুমি অস্থির হয়ে উঠছ।

অমল চেষ্টা করে হেসে বলে—না না। কি যে বলেন? কে বলবে আপনার বয়স বাড়ছে। বরং দিন দিন বয়স কমছে। আপনার বয়সী আমাব ছাত্রীও আছে। কত ইয়ার্কি হয় তার সাথে।

অপর্ণাদেবী পায়ের উপর পা তুলে হেসে বলেন—তাই বুঝি? তুমি ইয়ার্কি দিতে ভালবাস?

অমল চেষ্টা করে হেসে উত্তর দেয়—খুব ভালবাসি। চলুন একদিন সিনেমা দেখে আসি। সিনেমা ভালবাসেন?

অপর্ণাদেবী হাসেন—আমার বাঙলা সিনেমা একটাও বাদ যায় না বোধ হয়। বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। অপর্ণাদেবী হাসি বন্ধ করেন। অমল অধ্যাপক হতে চেষ্টা করে। যাদব সরখেল ঘরে প্রবেশ করেন। যাদব অমলকে দেখে কথা বলেন—নমস্কার অমলবাবু। ভাল আছেন? অনেকদিন পর দেখা হল। আলো পড়াশোনা ভাল করছে তো।

অপর্ণাদেবী, যাদব সরখেল এবং অমল দরজা খোলার শব্দ শুনে সেদিকে তাকাল। দেখল আলো-কে।

অপর্ণাদেবী বললেন—এ তো রাত করে ফিরলে যে।

আলো দ্রুত উত্তর দেয়—সকালের টিউশেনিটা রাতে সেরে এলাম।

অপর্ণাদেবী পুনরায় বলেন—তোমাকে বলেছি টিউশনি ছেড়ে দিয়ে শুধু পড়াশোনা কর। সংসারের কথা তোমাকে ভাবতে হবে না।

আলো ভিতরের দরজার পর্দা সরিয়ে অন্দরে যাবে সেই মুহূর্তে মার এ কথাগুলো শুনতে পেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। মার দিকে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দৃষ্টিটা যাদব সরখেলের মুখের উপর দিয়ে নিয়ে অমলকে দৃষ্টির বাইরে রেখে দ্রুত অন্দরের ভিতর চলে গেল।

যাদব সরখেল তখন মাত্র বলতে সুরু করেছিল—হ্যাঁ মা তোমাকে এখন টিউশনি করতে হবে না। পড়াশোনা কর এম, এ, পরীক্ষা খুব কঠিন আছে।

আলো যাদব সরখেলের অস্ফুট সকল কথা শুনতে পায় নি। যাদবের স্বরে মৃদু হাওয়ার কম্পন।

অমল বলে—চলি মাসিমা।

অপর্ণাদেবী বলেন—আবার এসো।

অমল বের হয়ে গেল।

যাদব নিম্নস্বরে বলে—ব্যাপার কি বলতো? কিছু টের পেয়েছে?

অপর্ণা উত্তর দেন—বুঝতে পারছি না। তুমি আর দুই সপ্তাহ এসো না।

যাদব সরখেল বলে—ঠিক আছে। স্ত্রীর অসুখটা আবার বেড়েছে। ওদিকে ছেলেটাও ব্যবসায় ভাল করে মন দিচ্ছে না।

মাঝে মাঝে মদ খেয়ে ঘরে ফেরে। কি যে করি। কেমন করে কি হয়ে গেলাম।

যাদবের শেষ কথাগুলো ঘরের আলোয় চিক্ চিক্ করে উঠল। তিনি আবার বলেন—অপর্ণা। আমি চলি।

যাদব সরখেল দরজার বাইরে অন্ধকারে থেকে বললেন—কিছু দেব ?

একদরজা আলো যাদবের ধুতি পাঞ্জাবীর উপর লেপ্‌টে আছে। মুখে অন্ধকারের ছায়া। যাদবের কথা শুনে অপর্ণা বলেন—কিছু লাগবে না। অন্যদিন।

অপর্ণাদেবী দরজা বন্ধ করে অন্দরের ঘরে গেলেন।

আলো আটপৌরে তাঁতের শাড়ি মাত্র পড়েছে। মাকে দেখতে পেয়ে ঘর থেকে বের হতে চেষ্টা করল। কিন্তু ফিরে দাঁড়াল মার কণ্ঠস্বর শুনে। অপর্ণাদেবী বললেন—দাঁড়াও, তোমার বাবা মরে যাওয়ার পর কত কষ্ট করে তোমাকে আর বাবলুকে লেখাপড়া শেখাচ্ছি। ভেবেছি এত কষ্ট থাকবে না যদি তোমরা লেখাপড়া শিখে কিছু একটা কর। কিন্তু এখন দেখছি আমার সকল কষ্ট বৃথা গেল। এত স্বাধীনতা কি ভাবে পেলে ?

আলো স্পষ্ট জবাব দেয়—তোমার কাছ থেকে। এ বছর আমি পরীক্ষা দেব না।

আলো ঘর থেকে বের হয়ে গেল। বাইরের ঘরে চলে এল। অপর্ণাদেবী পেছন পেছন ঐ ঘরে গিয়ে বললেন—তাহলে যেখানে খুসি চলে যাও।

আলো শান্ত কণ্ঠে উত্তর দেয়—বলতে পার মা একশ বার। তোমার বাড়ী, তুমি ত বলবেই। আর আমি চলে গেলে তোমারও সুবিধা হয়।

অপর্ণাদেবী ভয়ানক ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি বললেন—কি বলতে চাস তুই।

পূর্বের মত শান্ত কণ্ঠে আলো বলে—তুমি এখন ও ঘরে যাও মা। আমার ভাল লাগছে না। আমি একা থাকব।

অপর্ণাদেবী অন্দরের ঘরে আর কোন কথা না বলে চলে গেলেন। আলো ঘরের আলো নিভিয়ে দেয়। ঘর অন্ধকার হয়। চেয়ার টেনে নিযে আলো জানলার কাছে বসে। আকাশে মুখ তোলে। দেখতে পায়, মন্থব গতিতে মেঘ চলেছে। স্মৃতির সৌরভ। আলো শ্যামলের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠে শ্যামলের বোদলেয়ার আবৃত্তি,

বলো আমাকে, রহস্যময় মানুষ, কাকে তুমি সবচেয়ে ভালবাসো,
তোমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা অথবা ভগ্নীকে?
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী—কিছুই নেই আমার।
তোমাব বন্ধুরা
ঐ শব্দেব অর্থ আমি কখনো জানিনে।
... ...
বলো তবে, অদ্ভুত অচেনা মানুষ, কী ভালবাসো তুমি?
আমি ভালবাসি মেঘ চলিষ্ণু মেঘ···ঐ উচুতে···
ঐ উঁচুতে আমি ভালবাসি আশ্চয মেঘদল।

পাঁচ

তুই শেষ পর্যন্ত অরুণাকে বিয়ে করলি।

অমলের প্রশ্ন শুনে নিরুপম বিরক্ত হল। বিরক্ত প্রকাশ করল না। চুপ করে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চারমিনার টানতে থাকে। কিছুক্ষণ পর একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলে—তোর মতো-তো হতে পারিনি দশটা মেয়েকে ঘাটবো। তুই কি করে পারিস অমল? বিবেকে বাঁধে না। আবার গর্ব করে বলেছিস সেদিন তুই ডিগ্রীকোর্সের ছাত্রী, কি না নামটা, থাক্‌গে মনে পড়ছে না, অন্ধকার লেকে ঘুরে এলি। একের পর এক দেহ হাতরিয়ে কি লাভ। তুইতো এককালে বৃদ্ধ হবি। তখন নিজের মনের কাছে কি কৈফিয়ৎ দিবি। তখন তো যৌবন তোর এবং তোর স্ত্রীর নষ্ট হয়ে যাবে। একটি পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের তৃষ্ণায় মরবি। অধ্যাপক হয়েছিস তেলিয়ে, বুঝকি কি হারামজাদা।

নিরুপম চারমিনার ঠোঁট দিয়ে চেপে অনেকটা ধোঁয়া টেনে নেয়। চারমিনারের ছাই চাপা আগুন হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে আর বলছে—তবে তুই ইজিলি আলো-কে বিয়ে করতে পারতিস। অনেকদিন ওকে নিয়ে ঘুরছিস।

অমল নিরুপমের ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখছিল। হঠাৎ আলো-র কথা কানে যেতেই বললো—অনেক ঘাটের জল খাওয়া মেয়ে, ওদের আর কিছু বাকি আছে নাকি। যাক্‌ ঘরটা তো অরুণা বেশ সাজিয়েছে। লেনিনের পাশে বুদ্ধ।

দেয়ালে টানানো ফটো দুটোর দিকে নিরুপম তাকাল। ঠাণ্ডা স্মৃতি জড়ানো শান্ত চোখ নিরুপমের।

নিরুপম বলে—মনের জন্য বুদ্ধদেব। বাঁচার জন্য লেনিন। মাঝে মাঝে ভাবি অমল, সক্রিয় রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে ভাল করিনি। গণতন্ত্র রাষ্ট্রে সক্রিয় রাজনীতি করতে না পারলে দেশটা মরবিড হয়ে পড়ে। এগিয়ে চলতে পারে না। মাঝে মাঝে ভাবি সরকারী কাজটা ছেড়ে দিই। চীৎকার করে বলি, ইনক্লাব জিন্দাবাদ, ভাইসব, আজ আমরা অসুস্থ, বিকারগ্রস্থ, দুর্নীতিপরায়ন, তাঁবেদার, অতএব···না, অমল কেমন যেন দিন দিন, চাকরীটা পাওয়ার পর দুর্বল হয়ে পড়ছি। দুর্বলরাই ভোগবাদ চর্চা করে। নতুবা বাঁচবাব আশায হৃদয় অথবা ভালবাসার একান্ত কাঙাল হয়। যেমন আমি হয়েছি।

অমল এবার বসল। দেশলাই-পিঠের উপর পানামা তিনবার ঠুকে অমল বলে—তোরা বেশ সুখে আছিস্? বিয়ের পর ঢাকুরিয়া কোনদিন গিয়েছিস্?

নিরুপম যায় নি।

পরেশ মণ্টু এদের খবর কি?—নিরুপম প্রশ্ন করে।

বেশ সুখে আছে ওরা। পরেশ এখন মদ খাচ্ছে। মাঝে একদিন আলোর সাথে দেখেছি। শালা মাগীটা প্রত্যেক পুরুষকে জ্বালিয়ে মারল। এসব মেয়েদের হৃদয় বলতে কি কিছু নেই? এইতো অরুণা, বেশ মেয়ে। শ্রদ্ধা হয়। যাক্। মণ্টু এম এস সি পাশ করে রিসার্চ স্কলারসিপ পেয়েছে।—অমলের কথাগুলো নিরুত্তাপ। কথাগুলো বলতে একটা উত্তেজনা আনতে চেয়েছিল। অরুণা এলো ঘরে। দু হাতে চায়ের কাপ-প্লেট।

নিরুপম ইজিচেয়ার থেকে উঠে চায়ের কাপ-প্লেট নামিয়ে রাখে।

অরুণা হাসে। অরুণা কথা বলে—কেমন আছেন?

অমল উত্তর দেয়—ভাল। দেখতে এলাম তোমাদের সুখের সংসার।

নিরুপম বলে অরুণাকে—চায়ের সাথে আর কিছু আনলে না? কলা এনেছি। ওপরের তাকে ডান পাশে কাগজে মোড়ানো আছে, নিয়ে এসো।

অমলের কথা—থাক না। ওসবের দরকার নেই। তুমি বস। একটু গল্প করি।

এই আসছি—অরুণা ছুটে চলে গেল।

আটপৌরে ডোরাকাটা শাড়ির আঁচল বুকে ঠিক করতে করতে অমলের পাশ দিয়ে অরুণা ছুটে চলে গেল। অমল অরুণার দ্রুত ছোটা জনিত হাওয়ার স্পর্শ পেল। এবং অমল কতক্ষণ চুপ করে বসে রইল কথা হারিয়ে। নিস্তেজ, ভয়ানক নিস্তেজ চোখে বুদ্ধদেবের মূর্তিটার দিকে অমলের দূরস্মৃর্য্য দৃষ্টি।

তিনখানা কলা নিয়ে অরুণা ঢুকল আবার। চুলগুলো কানের পাশ দিয়ে ঘামে আটকে আছে। চুলের ফাঁক দিয়ে কিছু কিছু বড় রিং-এর অংশ দেখা যাচ্ছে। কপালে সিঁদুর নেই। সিঁথিতে অস্পট এক চিলতে সিঁদুরের দাগ। হাতে শুধুমাত্র একজোড়া বালা। কড়ে আঙ্গুলে একটি আংটি। অরুণা সুন্দর হয়েছে। অরুণা অপূর্ব হয়েছে। দেহে, কথায়, ব্যবহারে অরুণা শুদ্ধ ভালবাসার কণারক।

এই নিন্—অরুণা অমলকে কলা দিল একটা।

ইজিচেয়ারে শুয়ে থেকে নিরুপম হাত বাড়িয়ে বলে—আমারটা।

অপেক্ষা কর, আমি ছুলে দিচ্ছি—অরুণা ইজিচেয়ারের হাতলে গিয়ে বসল নিরুপমের পাশে। অমল দেখল, খুব ধীরে

ধীরে তিনটি লম্বা আঙ্গুল দিয়ে অরুণা একটি কলার খোসা ছাড়াচ্ছে। কলার খোসা মুঠো করে নিয়ে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। খোসা মুক্ত কলার গা থেকে সযত্নে আশ্ টেনে টেনে বের করছে। নিস্তেজ, ভয়ানক নিস্তেজ চোখে অরুণার মুখের দিকে অমলের গোপন দৃষ্টি। অমল তখন কলা খাচ্ছে নিজে হাতে খোসা ছাড়িয়ে। মুখে যেন কলার স্বাদকে সে বুঝতে পারছে না। সে একটা কিছু এই মনোভাব নিয়ে অমল দেখল, অরুণা কলাটা ভেংগে নিরুপমের মুখে দিয়ে দিল। নিরুপম কলা চিবোচ্ছে।

মুখে কলা রেখে নিরুপম—তুমি খেলে না?

অরুণা নিরুপমের কলা থেকে একটু ভেংগে নিয়ে খেল। ওদের দিকে অমল স্থির নিশ্বাসে তাকিয়ে আছে। অমল অনেক কথা বলে, অনেক কথা শোনে। এই মুহূর্তে অমলের আর কথা বলতে ভাল লাগছে না, আর কথা শুনতে ইচ্ছা করছে না। আলো অরুণার চেয়ে কত, কত সুন্দর, রঙে, স্বাস্থ্যে, চুলে, লম্বায়। রেবা অরুণার চেয়ে আরও সুন্দর।

অথচ, অমল স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং দেহের কোন অজানিত গোপন অংশে ব্যথা অনুভব করে। স্বভাবতঃ ব্যথা বিষন্ন করে অমলকে। অমল ওদের সাথে কথা না বলে ভাবে, আলো সুন্দর, অরুণা কুৎসিত। অরুণার ভালবাসা সুন্দর, আলো সেখানে কুৎসিত। অমল ওদের দিকে তাকায়। ওরা কেউ বুঝতে পারছে না, অমল এরকম ভাবছে, অরুণাকে যদি ভালবাসতে পারতাম। অরুণা যদি নিরুপমের স্ত্রী না হয়ে আমার হত। তাহলে, তাহলে আমাকেও নিরুপম হতে হত।

অমল উঠে দাঁড়িয়ে বলে—আজ আমি চলি নিরুপম। চলি, অরুণা। বেশ ভাল লাগল তোদেরকে দেখে নিরুপম।

অরুণা বলে—আবার আসবেন কিন্তু।

নিরুপম বলে—এই মুহূর্তে তোকে অবিশ্বাস্য রকমের অধ্যাপক অধ্যাপক মনে হচ্ছে।

অমল একটু হেসে বলে—আমি জাত অধ্যাপক হতে চেষ্টা করছি। পারছি না। চলি, বাড়িতে ছাত্রী বসে আছে।

'পারছি না' এই পাথুরে কথাটা সেই মুহূর্তে অমলের হৃদয়ে চেপে বসে যন্ত্রনায় আবদ্ধ করে রাখল। যন্ত্রনায় আবদ্ধ এবং অমলের বিষণ্ণ মনের কথাগুলো শান্ত এবং গম্ভীর হয়েছে। অমলের চোখে শেষ অন্ধকারে ফুল ঝরে পড়ার শব্দ।

অমল পথ চলছিল। ডানপা'টা একটু উঁচু করে এবং টেনে টেনে অমল চলছিল মন্থর-গতিতে। মনে হয়, অমল ভয়ানক কর্মক্লান্ত। অমলের পাশ দিয়ে দুটি সুসজ্জিতা তরুণী এগিয়ে গেল। কাটা-ব্লাউজে মসৃণ অর্ধেক পরিচ্ছন্ন পিঠ খোলা। নিখুঁত শরীরের ভাজ স্পষ্ট হয়ে বিকশিত। অমল দেখছিল, পরিমিত নিতম্ব মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছে। তরুণী দুজন অনেকদূর চলে গিয়েছে। অমল দেখল, ওরা অবশেষে ছোট হতে হতে বিন্দু হল। পরে বিন্দু মিলিয়ে গেল। অমল আবার দেখল, আবার দুজন মেয়ে অনেকদূর থেকে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। বিপুল প্রসাধনে মুখশ্রী উজ্জ্বল। পরচুলায় মাথার চুলগুলো বাবুই পাখীর বাসা। বিশ্রী রকমের পাতলা ব্লাউজ। যতটা সম্ভব ইচ্ছা করে নিবিড় স্তনদ্বয়কে উচু করে বেঁধেছে। অমলের পাশ দিয়ে ওরা দুজনও অদৃশ্য হয়ে গেল। অমল মন্থর গতিতে হাঁটছে। পেছন ফিরে তাকাল না।

আসলে অমলের চোখের উপর দিয়ে একটু রোদ্দুরের উত্তাপ ছিঁটিয়ে চারজন সুবোধ অবিবাহিত কুমারী চলে গেল মাত্র।

এরা এই মুহূর্তে অমলকে খুসি করতে পারল না। কিছুতেই

অমল মোহাচ্ছন্ন হতে পারল না। বরং অমল আরও ক্লান্ত হল। পা দুটোকে দুর্বল মনে হল। অমলের মনে হল সে অনেকক্ষণ ধরে পথ হাঁটছে, অনেক ক্রোশ পথ সে হেঁটে এসেছে, এখনো হাঁটছে, গুহা থেকে বের হয়ে একদল লোক হাঁটছে। তাদের মিছিল এক দিগন্ত শেষ করে অন্য দিগন্তে পা বাড়াচ্ছে। আরও হাঁটবে। স্বভাবতই সে পাদুটোকে আর টানতে পারছে না। কিন্তু ওকে টানতে হবে, যদি মৃত্যু হয়, তবু টানতে হবে। অমল দুর্বল, অসুস্থ, বিকারগ্রস্থ লোকদের মত ধীরে ধীরে, অতি ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে এক কলাওলার কাছে দাঁড়াল। কলাগুলোর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে অমল ভাবল, সুসজ্জিতা উগ্র আধুনিকা মেয়েদের চেয়ে নিরুপমের স্ত্রী কুৎসিত অরুণা সুন্দর, এবং সুন্দর। সুন্দর ব্যতীত আর কিছু ভাবা যায় না অরুণাকে।

অমল দুটি মর্তমান কলা কিনে আবার মন্থর গতিতে পথ চলতে সুরু করে। অথচ নিরুপমের কাছে অরুণা নেহাৎ একটি মেয়ে যে যুবতী নয়, যুবতী হতে গেলে যে প্রসাধন স্বাস্থ্য ও লোভনীয় লাবণ্য দরকার তা অরুনার নেই। এবং যার বয়স, স্বাস্থ্য ও যৌবন দুপুরের হাই তোলার মত ঝিমিয়ে পড়েছে।

রোদ্দুরের উত্তাপ অমলের মাথার উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে মাতালের ঢঙে। অমল উত্তপ্ত এবং ক্লান্ত। ভয়ানক উত্তপ্ত এবং ভয়ানক ক্লান্ত অমলের চোখ জ্বালা করছে। অমল হাতের চেটোর দিকে এবং পরে আঙুলের এবং আরও পরে নখের দিকে তাকিয়ে এইরূপ স্থির বিশ্বাসে এল যে ওর শরীরে এখনও রক্ত আছে। রক্ত দেখে ওর মনে চলিবার আত্মপ্রত্যয় জাগল। তবু ওর আকাঙ্ক্ষা যদি একটু গাছের নিচে বসতে পারত। একটু হাওয়া পেত এবং ছায়া পেত।

অরুণা-নিরুপমের সংসার এবং ভালবাসা অনেকক্ষণ ধরে

মনের ভিতর গজরাচ্ছিল। ঐরূপ চিন্তা থেকে সে ভাবল, ভালবাসা+ছায়া+উত্তাপ=পরিতৃপ্ত, কোন এক যুগে ছিল। কিন্তু এখন, ভালবাসা+উত্তাপ—ছায়া=অতৃপ্ত। ভালবাসা এবং জীবন সংক্রান্ত এইরূপ একটি মনগড়া গবেষণা তৈরী করে অমল একদিকে যেমন আনন্দ পেল, তার চেয়ে বেশী দ্বিগুণ যন্ত্রণা এবং বেদনা অনুভব করল। অমল বুকে হাত রাখে।

রেবা অনেকক্ষণ অমলের পরিচ্ছন্ন এবং সজ্জিত ঘরে বসেছিল। একবার বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিল। হাত দুটো উপরের দিকে তুলে বিনুনিটা বুকের উপর রাখে। পা দোলায়। আবার উঠে। অমলের একটি সাহিত্য মাসিক পত্রিকা নিয়ে ফের অমলের খাটের উপর শুয়ে পড়ে। পাতা ওল্টায়। আবার রেখে দেয। টেবিলে একটি আধুনিক কবিতার বই পড়ে আছে। বেবা তুলে নেয় দ্রুত। রেবা অনেক শুনেছে, আধুনিক কবিতা এবং নতুনরীতির গল্প না পড়লে সাহিত্যের যুবকরা শিক্ষিত মেয়েদের আমল দেয় না। রেবার সাথে পরেশের বন্ধুত্ব ঘটিয়েছে অমল। রেবা পরেশের কথা ভাবে। কবিতার বইয়ের পাতা ওল্টায়। কদাচিৎ কবিতার লাইন পড়ে। কয়েকটি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারে না। বিশেষ করে সে যখন স্তন, নিতম্ব, যোনি, চুম্বন কথাগুলো বারংবার কবিতার প্রত্যেক রেখায় চিত্রিত হয়ে আছে দেখতে পেল তখন সে বইটা আলতোভাবে টেবিলে রেখে দিল। খাটের উপর উঠে বসে। পা দোলায়। হাত দিয়ে কানের পাশের চুলগুলো টেনে এনে ছেড়ে দেয়। শাড়ির প্রান্ত দিয়ে ঠোঁটটা একটু ঘসে।

অতীতে একদিন। এই ঘরে, নন্দলাল বসুর অপ্রতিম স্তব্ধতার অন্তরালে উদার আকাশ, আর অপ্রমত্ত বিস্তৃত নদী, অদূরে একঝাঁক

শুভ্র বিহঙ্গ। যামিনী রায়ের শান্ত নম্র, সতেজ প্রাকৃতিক কন্যা। চোখ দুটো টানা প্রশান্ত অবধান এবং একটি ক্যালেণ্ডার, জ্যামিতিক টোনে অংকিত এ্যাবষ্ট্রাক নারী। অমল আর রেবা।

রেবা প্রতিটি ঘটনা দেখতে পায়, প্রতিটি কথা শুনতে পায়, যেমন শিল্পী নগ্ন মডেলের দেহের প্রতিটি অংশকে নিপুন ভাবে দেখে। দুহাতের ভিতর রেবার মুখটা নিয়ে ঠোঁটে প্রলম্বিত চুম্বন এঁকে দিয়েছিল। রেবাও লতানো পুষ্ট গৌরবর্ণ হাত দুটো, যে হাতে শুধু বালা ছিল এবং একটি ছোট্ট ঘড়ি অমলের দুপাশ দিয়ে পেছনে নিয়ে অমলকে জড়িয়ে ধরেছিল।

কিন্তু অমল সেই মুহূর্তে মুখটা সরিয়ে এনে বলেছিল—এবার চল পড়বে।—অমল হাসছিল।

সেদিন রেবা স্বাভাবিক উত্তর দিয়েছিল—আজ পড়তে ভাল লাগছে না। আজ থাক।

রেবা সটান প্রশ্ন করেছিল সেদিন—আচ্ছা অমলদা আপনি আমাকে নিয়ে এরকম করেন কেন ?

অমল উত্তর দেয়—একটু আনন্দ পাওয়ার জন্য। কেন, তুমি আনন্দ পাও না ? এতে পাপ নেই, ভয় নেই। শুধু আনন্দ, ওমর খৈয়াম পড় নি ?

রেবা বলে—কিন্তু আমি যখন একা থাকি, নির্জন পরিবেশে কেউ কোথাও নেই, তখন আপনার কথা আমার মনে হয়, ভয়ানক কষ্ট হয়। রাতে ঘুম হয় না। কেন কষ্ট হয় জানেন ?

অমল রেবাকে কাছে টেনে নিয়ে বলেছিল—কেন ?

রেবা অমলের বাহু বেষ্টন থেকে নিজেকে মুক্ত করে এনে বলেছিল—শুধু দেহের সুখের কষ্ট নয়। আমরা যেমন সুখকে চরম করে চাই তেমনি দেহের সুখকে মন থেকে মুছে ফেলতেও দ্বিধা করি নে। কিন্তু আপনি এই আনন্দ আমার কাছ থেকেই ভোগ

করেন না। অনেক সরল ছাত্রী আপনার শিকারী হয় আমি জানি। কারণ আপনি শিক্ষিত, ভদ্র, রুচিবান, তাই তারা প্রতিবাদ করে না লজ্জায়, করুনায়, আর কিছুটা ভয়ে। জীবনে বেঁচে থাকার এই কি মূলকথা অমলদা! পুরুষদের এই ভাল্‌গারিজ্‌মের অর্থ কি? ওরা কি একজন মেয়েকে আন্তরিক ভাবে সারা জীবন ভালবাসতে পারে না।

এমনি সময় হাতে দুটো মর্তমান কলা নিয়ে অমল বাড়িতে এবং ওর সাজানো ঘরে ঢুকল। ভীষণ পরিশ্রান্ত হয়ে পাতা বিছানায় ধপ করে বসল। টেবিলে কলা দুটো রেখে একটি বালিশ টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল। অদূরে সোফার উপরে বসে রেবা পাঠ্য পুস্তকের পাতা ওল্টাতে থাকে। এবং মনে মনে এই পণ করে যে সে আজ অমলদার ভাল্‌গারিজ্‌মের কৈফিয়ৎ চাইবে। রেবা মাথা তুলে শান্ত ভাবে বলে—আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে খুব ক্লান্ত। আজ যাই। কাল আসব।

অমল ছাদের দিকে চোখ রেখে একটি ছোট নিশ্বাস বুক থেকে টেনে নিয়ে ত্যাগ করে বলে—কখন এসেছ। বস। একটু বিশ্রাম করে পড়াচ্ছি। বরং কলা দুটোর খোসা ছাড়াও। তুমি একটা খাবে আর আমাকে একটা দিও।

রেবা আবার শান্তস্বরে বলে—আমি খোসা ছাড়াতে যাব কোন দুঃখে? কলা খাব না। বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি। বরং আমি কলা দুটো মাসিমাকে দিয়ে আসছি। মাসিমা আপনার খাবার পৌঁছে দিয়ে যাবেখন।

মায়ের কথা ভাবতে গিয়ে অমল আতংকিত হয়। এই মুহূর্তে সে মাকে চায় না, মায়ের উপস্থিতি চায় না। সে বিছানা থেকে উঠে বসে বলে, কলা দুটো হাতে নিয়ে—এই নাও ধর, যদি ইচ্ছা হয় খাও না হয় ফেলে দাও।

রেবা কোন উত্তর দিল না। চুপ করে বসে রইল।

অমল বিছানা ছেড়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে রেবার সন্নিকটবর্ত্তী হতেই রেবা অনেকটা সরে লম্বা সোফার কোনে বসল। অমল রেবার পাশে বসে হঠাৎ একটি প্রশ্ন করে বসল—রেবা তুমি আমাকে বিয়ে করতে পার না?

যদিও রেবা লজ্জিত তথাপি সে হেসে উত্তর দিল—আপনার যে অনেক বয়স। কেমন যেন…।

অমল শান্ত স্বরে বলে—বুড়োটে বুড়োটে ভাব। অর্থাৎ আমার বয়স হচ্ছে, হবে, রেবা আরও হবে। কেন অনেক অল্পবয়সী মেয়েরাতো বয়স্কদের বিয়ে করে, তুমি পার না রেবা? জান, এখন আমি অনেক টাকা উপার্জন করি আয় করি, প্রায় চার'শর কাছাকাছি। তোমার কোন কষ্ট হবে না।

রেবা উঠে দাঁড়িয়ে বলে—দাঁড়ান মাসীমাকে বলছি শীঘ্রি যেন আপনার বিয়ে দেয়। আপনি অনেক ভাল পাত্রী পাবেন। আমাকে কেন? আমি যাচ্ছি অমলদা। এরকম কথাবার্তায় পড়া হয়। তাছাড়া আপনি ভীষণ ক্লান্ত।

দরজা খুলে রেবা বই হাতে নিয়ে চট্ করে বের হয়ে যায়। অমল সেদিকে তাকিয়ে থাকে। অমলের চোখের পাতা স্থির এবং চোখের মণি নিশ্চল। মনে হচ্ছে, অমলের জড়ত্বে নিমগ্ন মন যেন একরাশ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ভয় বিমূঢ় হয়ে চলতে পারছে না নড়তে পাড়ছে না, এগোতে পারছে না।

অমল ছাদের দিকে নিশ্চল চোখ দুটো নিবদ্ধ রেখে বর্তমান যুগের ক্লান্ত দেহটাকে সোফায় এলিয়ে দেয়।

ছয়

বিশাল গঙ্গার হাওয়া লাগছিল পাতায়। অপরাহ্ণের রোদ্দুরের স্পর্শে বটবৃক্ষের চিক্ চিক্ পাতাগুলো থির্ থির্ করে কাঁপছিল। মাঝে মাঝে পাতা ঝরে, একটা দুটো তিনটে এবং হঠাৎ হাওয়ার স্পর্শে একত্রে অনেক শুকনো পাতা উড়ে গিয়ে অনেকদূর গড়ায়। কদাচিৎ গঙ্গার জল ছোঁয়। ধীর স্রোতে ভেসে যায়। বটবৃক্ষের নিচে প্রলম্বিত ছায়া পাতঝরের শব্দে স্তম্ভিত। বিরাট নৈঃশব্দে পরেশের কণ্ঠস্বর ভেসে ওঠে—এখানকার গঙ্গা আশ্চর্য রকমের শান্ত। যেন শান্ত নিদ্রিত শিশু মায়ের কোল জুড়িয়ে আছে।

আলো উত্তর দেয়—আমার মনে হয় হাওড়া ব্রীজের নিচে মন্দাকীনি কম শান্ত নয়। আমাদের চোখ নেই, হৃদয় নেই, তাই বুঝতে পারি নে। বিদ্যুৎ আলোর বন্যায়, লোকের ভীড়ে, নিজেদের স্বার্থচিন্তায়, ট্রামবাসের ভয়াল শব্দে, জাহাজে, নৌকায় হাওড়ার গঙ্গা হারিয়ে গেছে।

ওরা দুজন আবার নৈঃশব্দে ডুব দিল। অল্পতেই দম্ ফুরিয়ে এলে আলো পরেশের কবিতা-প্রসঙ্গ তুললো, বললে—বেশ লাগলো আপনার কবিতা। তবে আমার একটা প্রশ্ন আছে। জীবনের প্রতি আপনি এত হতাশ কেন? নৈরাশ্যের নিশ্বাস আপনার কবিতায় বড্ড বেশি।

পরেশ দেখল বটবৃক্ষের ছায়াবৃত শাখায় একটি দুর্গাটুনটুনি ঠোঁট দিয়ে পালক নাড়ছে। পরেশ বললে—সুন্দর ও আনন্দের জন্ম

প্রেমে স্নেহে অহিংসায়। এই যুগে এই তিনটির মৃত্যু ঘটিয়েছে মানুষের সংকীর্ণ বুদ্ধি এবং স্বার্থ চিন্তা। একদিন বেকার ছিলাম। তখন মা বাবা দাদা বৌদি সবার কাছ থেকে পেয়েছি অনেক যন্ত্রনা। তার-পর একদিন চাকরী পেলাম সুপারিশে প্রায় একশটাকার মতো খরচ করে, বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার করে, প্রতারণা করে, ফাউন্টেন-পেন বন্ধক দিয়ে। চাকরী হয়ে গেল। তারপর দেখলাম স্বার্থের উত্তাপ থেকে জন্ম নিল প্রত্যেকের বিকলাঙ্গ ভালবাসা। কেমন যেন একটা প্রতিহিংসায় আমি দপ্ করে জ্বলে উঠলাম। তাকে এখনও নেভাতে পারছি না।

আলো ওর শুভ্র বলিষ্ঠ নগ্নহাত বাড়িয়ে পরেশের হাত থেকে কবিতার খাতাটা তুলে নেয়। পৃষ্ঠা ওল্টায়, বলে—এখনতো চাকরী করছেন তবে বর্তমান সময়ের কবিতাগুলো অস্পষ্ট হেয়ালী, নিরাশ হয়ে উঠছে কেন ?

পরেশ নদীর বুকে একটি চলমান নৌকোর দিকে তাকিয়ে বললে—স্বার্থের উত্তাপ থেকে যে বিকলাঙ্গ ভালবাসা জন্ম নেয়, সেখানে আমার কর্তব্য আছে, শ্রদ্ধা নেই অন্তর নেই, গতি সেখানে স্তব্ধ। আমি বিশ্বাস করি না, মা তার ছেলেকে ভালবাসে। যে ছেলে উপায় করে প্রচুর তাদের প্রতি মায়ের অঢেল ভালবাসা আর যে ছেলে রুগ্ন তার প্রতি করুণা, আর যে ছেলে ডানপিটে সহজসরল তার প্রতি মাতৃত্বের কর্তব্য শুধু। আমি বিশ্বাস করিনা স্বামী বা স্ত্রী পরস্পরকে ভালবাসে। তারা শুধু আর্থিক আর দৈহিক কর্তব্যে বাঁধা।

আলো পরেশের একটি কবিতার উদ্ধৃতি বের করে বলে—তাই বুঝি আপনি বলেন, একত্রিশ বয়সের ভারে অবনত এবং ক্লান্ত এ হেন ক্ষয়িষ্ণু যৌবন সমর্পিত নারীর সুঠাম দেহে, হৃদয় তুচ্ছ। আরও বলি, অতন্দ্র প্রহরীর মত ধসিত যৌবন নিরন্তর প্রস্তুত নরক দুয়ারে। কবিতার নাম—নরকে যুবকের অভিজ্ঞতা থেকে।

দুটো গঙ্গাফড়িং পাখার ঝাপটায় আলাদা হয়ে উড়তে লাগল, এরকম একটি পলক দৃশ্য ওরা কেউ লক্ষ্য করল না।

বাতাসে আলো শুনতে পায় পরেশের ভগ্নকণ্ঠ—আমরা যেমন একদিকে মৃত্যুকে ভয় পাই, অপরদিকে জীবনকেও ভয় পাই। ক্রমশ আমরা শামুকের মতো গুটিয়ে ফেলছি নিজেদেরকে।

আলো উত্তর দেয়—পুরুষের মতো চলতে পারেন না বলেই আপনারা আড়াল চান। এককালে অন্ধকার গুহা-গহ্বর থেকে মানবজাতি বের হয়ে এসেছিল সূর্য্যালোকে। আর এখন, আবার আমরা ফিরে যাচ্ছি মনের অন্ধকার গুহায়। আশ্চর্য্য।

একটি ছোট্ট লাল পিঁপড়ে লম্বা আঙ্গুলের মত ঘাসের শীর্ষ-প্রদেশে পৌঁছে থম্‌কে রইল। আর উঠবার জায়গা নেই, এরপর বিশাল শুন্যতা যেমন প্রতিটি পর্বতের চূড়া বিশাল শুন্যতায় এবং নৈঃশব্দে ডুবে থাকে। ওরা কেউ লাল পিঁপড়েকে লক্ষ্য করল না। পরেশ একটু নড়েচড়ে বসে। আলোর শরারের স্পর্শ পায়। পরেশ মুহূর্তে স্পর্শ কাতরতায় ভোগে। আলো স্থির হয়ে বসে আছে বটবৃক্ষের ছায়ায়। পরেশের মনে হল, ঠাণ্ডা হাওয়ার নিঃস্বনে দুপুরের রোদটুকু বয়সের ভারে ক্লান্ত, বড্ড অবসন্ন।

আলো পরেশের কবিতার আরও কয়েকটি পাতা ওল্টায়। হঠাৎ একটি কবিতায় চোখকে খানিক নিবদ্ধ রেখে আবৃত্তি করে—নারীর হৃদয় দিয়ে আমি এবার গোলাপ চাষ করবো। মিথ্যা, যুগ সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা নেই পরেশবাবু। কোন অভিজ্ঞতা নেই। একদা হয়ত ছিল পর নির্ভরশীল নারীর হৃদয় দিয়ে গোলাপের চাষ। কিন্তু এখন নয়। বরং লিখুন, নারীর হৃদয় দিয়ে চাব্‌কাপো বীর্য্যহীন পুরুষকে। এযুগে নারীদের কি ভেবেছেন আপনি? এখনও কি ভেবেছেন, নারীরা পুরুষের ভোগের মন্দির, আর ভোগই সৌন্দর্য্য এবং কোমল?

পরেশ আলোর ঘনিষ্ঠ হয়। গোপনে আলোর দেহের স্পর্শ পেতে চায়, এরকম পরেশ মৃদু হেসে উত্তর দেয়—তা নয়তো কি?

আলো শাড়ির আঁচল ঠিক করে নিয়ে বলে—না, তা নয়। হয়তো কতক পর-নির্ভরশীল মেয়েরা ভোগের মন্দির হয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সব মেয়ে নয়। এ যুগে মেয়েরা বুঝতে শিখছে পুরুষদের সাথে মেয়েদের পার্থক্য একমাত্র সেক্স-এ। এ ছাড়া সবটাতেই ছেলেরা মেয়েরা সমান। চিন্তায়—বুদ্ধিতে—শিক্ষায়, হিংসায়—স্বার্থপরতায়—ছলনায়. স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-ভালবাসায়, নিষ্ঠুরতায়-প্রতারণায়-খুনপ্রবৃত্তিতে, খেলায়-শক্তিতে মেয়েরা ছেলে-দের সমকক্ষ। অতীত প্রমাণ করেছে, বর্তমান প্রমাণ করছে, ভবিষৎ প্রমাণ করবে। দুঃখ কষ্ট যন্ত্রনা ব্যথা বেদনা উভয়ের সমান। কর্তব্যে, দায়িত্বে কেউ কম যায় না। তাহলে পার্থক্যটা দাঁড়াচ্ছে কোথায় ভা ুন। গনজাগরণ কথাটা শুধু পুরুষদের জন্য নয়।

পরেশ একটু সরে বসে। আলোর দিকে তাকায়। কথা বলে—সত্যি আপনার সম্পর্কে আমার ধারণা দ্রুত পাল্টাচ্ছে। অবাক করছেন। বলুন শুনি।

আলো বলে যায়—মেয়েরা দেহ দিয়ে চট্ করে যেমন পুরুষদের চরিত্র বুঝে নিতে পারে, পুরুষরাও তেমনি অর্থ বিলিয়ে মেয়েদের চরিত্র বুঝবার চেষ্টা করে। তাই নোংরা মেয়েরা দেহবিলাসী হয়, ধার করে এনে শাড়ি-গহনা-ঘড়ি পড়ে, আর মেরুদণ্ডহীন পুরুষরা ঋণ করে অথবা প্রতারণা করে এনে অর্থ খরচ করে মেয়েদের পেছনে। এ ভাবে আমরা চরিত্রের কষ্টিপাথরকে হারিয়ে বসি, আমাদের অক্ষমতাকে ঢাকা দিই, সভ্যতার মুখোস পড়ি। জীবনের সত্য পথে চলতে পারিনা, প্রথমত সাহস হারিয়ে ফেলেছি দ্বিতীয়ত পথ ভুলে-গেছি।

কি পুরুষ কি নারী আমরা সভ্য হয়নি, প্রগতির পথে একপাও এগোতে পারি নি। বিদেশী মনোভাব নিয়ে চলতে অভ্যস্ত। আপনার কবিতা কোন পথকে নির্দেশ করতে পারে নি। পারবে কি করে? কবিস্বয়ং পথভ্রষ্ট। কতক যৌনতা আর আবেগ কিছু শব্দ, উদ্ভট উপমা এই নিয়ে রক্ষণশীল আতেলেকচুয়ালদের লুব্ধ এবং অন্ধ হাততালি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু কবি হওয়া যায় না।

পরেশের রৌদ্র দৃষ্টি ছোট ছোট ঘন সবুজ ঘাসের উপর আছড়ে পড়ল। রাস্তার পাশে পরিত্যক্ত শালপাতার ঠোঙার মত তাকিয়ে থাকে পরেশ আলোর দিকে, ধীরে ধীরে কথা কয়—আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করছে!

ইচ্ছাকে বের করে দিন—আলো উত্তর দেয়।

আপনি কি শুধু আমার কবিতাকে ভালবাসার আকর্ষণে ডায়মণ্ডহারবারে গঙ্গার ধারে এসেছেন? আর কোন উদ্দেশ্য নেই?

আলো তির্যক দৃষ্টি ফেলে পরেশের মুখে। কিছু একটা আবিষ্কারের নেশায় মগ্ন। না, শুধু একজোড়া বিধ্বস্ত চোখ ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না আলো। আহা এমন নিঃষ্করুন। আর কিছু ক্ষুধা চোখের পুতলীতে। হঠাৎ তৃষ্ণায় কম্পিত প্রাণ। এতক্ষণে আলো বুঝতে পারল পরেশ ওর গা ছুঁয়ে বসে আছে।

আলোর উন্মথিত যৌবন বলে উঠল—উত্তাপ সহ্য করতে পারবেন পরেশবাবু? এর চেয়ে বরং ইঞ্চি কয়েক তফাতে বসা ভাল নয় কি?

আলোর নিষ্ঠুর অথচ সুন্দর রসিকতায় উদাসীন হয়ে পরেশ পায়ের কাছে সেই ছোট্ট অসহায় লাল পিঁপড়েটাকে হত্যা করল। পরেশ বলে—আপনারা উত্তাপ পান না?

যথেষ্ট পাই। তবে মেয়েরা আগে দেখে ভালবাসা তারপর

দেহের তীব্র ক্ষুধার কথা ভাবে। আর পুরুষরা আগে দেখে দেহের ক্ষুধা, পরে ভালবাসার কথা ভেবে দেখে। কি, ঠিক বললাম না ?—আলো মৃদু হাসে,—চলুন, এবার ওঠা যাক্।

আশ্চর্য এই আলো। এতো মেয়ে দেখলাম, ঘুরলাম। আলোর মতো একটিও নয়, অসাধারণ। কি করে আমাদের হিন্দু সমাজে এরকম একটা মেয়ে জন্মাল। পরেশ অবাক।

পরেশ নৈঃশব্দে ডুব দেওয়া অপরাহ্নের আকাশে কয়েকটা পাখী দেখল। ভাবল, সন্ধ্যা হলেই আবার মাটিতে নেমে আসবে। যখন পাখীকে মাটিতেই ফিরে আসতে হবে আশ্রয়, খাদ্য এবং ঘুমোবার জন্য তখন ডানার প্রয়োজন কি ?

এ রকম একটা কথা ভাবতে ভাবতে পরেশ বললে—আমি আপনাকে ভালবাসি। আপনি বুঝতে পারছেন না কেন ?

আলো উত্তর দেয়—স্পষ্ট বুঝতে পারছি। শুনুন আমিও আপনাকে ভালবাসি। চলুন উঠি—

পরেশ খুশীতে আলোর হাতটা ধরতে যাবে, কিন্তু হঠাৎ কি ভেবে হাত না ধরে বলে—সত্যি বলছেন ? আপনি আমাকে ভালবাসেন ? পরেশ বসে থাকা অবস্থাতেই মুখ উপরের দিকে তুলে আলোর দিকে চেয়ে শিশুর কণ্ঠে বললে—আর একটু থাকবেন না ? বেশ ভাল লাগছিল। এরকম দিন আর কি আসবে ? আপনি এত সুন্দর সাজেন। খুব আধুনিক। ভাল লাগে।

আলো বলে—বিদ্রূপ করছেন নাতো। অনেকে আমার সাজকে নোংরা বলে। আড়ালে শুনেছি বেশ্যা বলতেও। অথচ হাত কাটা পেট কাটা ব্লাউজের অন্তরেও চোখের জল আছে। সেই জলে গালের পাউডার আর ঠোটের রঙ মুছে যায়। উঠুন।

পরেশ উঠল। আলোর সাথে এখানে আসিবার পুর্বে ভেবেছিল, সে ভালবাসার কথা মৌখিক ভাবে উচ্চারণ করবে। পরেশ এরকম

ভাবতে পেরেছিল কারণ আলোই নিজের ইচ্ছায় ডায়মণ্ডহারবারে আসতে চেয়েছিল। পরেশ বলেনি। তাহলে আলো কিসের আকর্ষণে এখানে এসেছে! ঐ গঙ্গা দেখতে অথবা ওপারের নির্জন অস্পষ্টতাকে অথবা বটগাছের ছায়ায় বসতে অথবা রেলগাড়ি চাপতে অথবা পরেশকে যাচাই করতে অথবা অথবা অথবা—

আলো ও পরেশ কথা না বলে এতক্ষণ হাঁটছিল।

আলো হঠাৎ বললে—আমার হাতের বালাটা জমা দিয়ে কিছু টাকা ধার এনে দেবেন। পারবেন? আছে কোন পরিচিত দোকান? অবশ্য এটা চোদ্দ ক্যাডেটের যুগ।

পরেশের মনে হল, বিকেল দ্রুত অস্তমিত হচ্ছে। মনে হল, আলোর অস্তিত্ব বিকেলের দ্রুত অস্তমিত রঙে অদৃশ্য হচ্ছে। কোথায়? কেন? পরেশ প্রশ্নের ঘূর্ণীতে ঘুরছে। স্বাভাবিক, মাথার দুপাশের শিরা দুটো দপ্ দপ্ করছে। আলোকে কাছে পেয়ে পরেশ প্রবল নিঃসঙ্গতায় মৃতের মতো অচেতন যেন সে কোন কোন এক অন্ধকার গুহায় বসে প্রেমালাপের পাঠ মুখস্থ করছে।

আলো কথা বলে—আমার কথায় উত্তর দিচ্ছেন না কেন?

পরেশ উত্তর দেয়—কত টাকা চাই? পরেশের চোখ অর্থের গর্বে জ্বলে উঠল।

আলো গম্ভীর কথা কয়—আপনারা একটু অবাক হোন? তাই' না পরেশ বাবু? টাকা ধার করা আমার একটা নেশা হয়ে গেছে। কতকগুলো মূর্খ পুরুষের কাছ থেকে টাকা নিতে আমি বেশ পুলক অনুভব করি। একটি বছর অপেক্ষা করুন। প্রত্যেকের টাকা আমি শোধ করে দেব। যতই পুরুষদের সাথে ঘুরি না কেন, কি বলুন, মেয়েতো খারাপ নই। ভাল কলেজ থেকে অনার্সে ভাল রেজাল্ট করে বের হয়ে গেছি। এম, এ পাশের পর একটি কাজ অবশ্যই পাব। পাব না?

পরেশ ডেক্রনের প্যান্ট থেকে পার্স বের করে। পার্সের চেনটা একটানে খুলে দুটো আঙ্গুল ভিতর ঢুকিয়ে বিশটাকা বের করে এনে বলে—এই নিন্।

আলো পরেশের হাত থেকে টাকা গ্রহণ করল।

আলো চট্ করে বালা খুলে বলে—এই রাখুন।

পরেশ আলোর হাত থেকে বালা গ্রহণ করল না।

আলো এবং পরেশ দুজনেই গম্ভীর। পবেশ ভাবছে, কখন সে আলো-কে পরিত্যাগ করে গুহা থেকে বের হয়ে একটু একাকী ঘুরবে, ভাববে, বসবে, হাওয়া খাবে, আকাশ দেখবে, জিরোবে। যদি সম্ভব হয় সে কবিতা লিখবে। আবোলতাবোল উত্তপ্ত মনের প্রলাপ বকে যাবে গদ্যের মধ্যে। ভয়ানক শরীর উত্তপ্ত হলে যেমন অসুস্থগণ প্রলাপ বকে। এবং কবিতাগুলোর ভিতর দিয়ে একটি সুর রচিত হবে ভালবাসা নেই, ভালবাসা পেলাম না। আর কতকগুলো শব্দ থাকবে যথা—সমাজ নরক হয়ে উঠছে, বেশ্যা, মদ, মাগী, স্তন, নিতম্ব, পেচ্ছাব, নর্দমার জল, পচা বাতাস সূর্য্য ও চন্দ্র, কাম ও ক্রোধ ও লোভ, সঙ্গম, গৃহস্থ ঘরের সুবেশা তরুণীর মডেল, বেয়াদব উত্তপ্ত শরীর. বিষাক্ত রক্ত, পুতি গন্ধময় পুঁজ এবং চোখের পিচুটি, অন্ধকার গর্ভ এবং ভ্রূন মাঝে মাঝে মায়ের কথা ও ঈশ্বরের প্রতি উক্তি। পরেশের ভিতর নারীর প্রতি প্রবল অনীহা দেখা দিল এই মুহূর্তে। আলো আবার বলে—ধরুন।

পরেশ ট্রেনের জানলা দিয়ে চলিষ্ণু মেঘের দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়—টাকার বদলে টাকা দেবেন, বালা নয়।

সে তখন কবিতার প্রথম লাইন মনে মনে আওরাচ্ছে যথা, নষ্ট নারীর নগ্নমূর্তি দেখে দেখে দেখে, ঈশ্বরের সন্তান আজ ভয়ানক ক্লান্ত।

॥ সাত ॥

পাশের বাড়ির ঠাকুর-দালান থেকে কাসর-ঘণ্টার শব্দের সাথে সাথে ঘন অন্ধকার নেমে এল আকাশে।

ঘরের মধ্যে প্রকম্প স্নিগ্ধ মোমের আলো। অথচ শ্যামলের মুখে মোমের আহত আলো। মংগল নীরব, মেদিনীপুরের ছেলেটি কথা বলে না বেশী। মোমের চারদিকে কাঁচের জার। জারের উপর ধূসর রঙের ছোট একটি পোকা মৃতের মতো স্থির। শ্যামল কথা কয়—এখনও আলো আসছে না।

জারের ভিতর মোমের শিখা কাঁপছে।

শ্যামল আবার কথা কয়—বুঝলি মংগল, পা'টা অনেক সুস্থ হয়ে উঠছে। তোর দিদিমণি না থাকলে বাঁচতাম না হয়তো। আর কয়েকদিনের মধ্যেই স্বাভাবিক ভাবে হাঁটতে পারবো।

পায়ের একটি বিশেষ স্থান দেখিয়ে দিয়ে পরেশ বলে—এখানটায় ভাল করে মালিশ কর।

মংগল নীরবে কাজ করে, কথা বলে না।

আলো সময়মতো না এলে শ্যামল সন্ত্রস্ত হয়। কিসের এক সাধুশব্দের মত আশঙ্কা শ্যামলকে আহত করে। মনে আলো-কে বুঝতে চেষ্টা করে, বিশ্লেষণ করে। ক্লান্ত হয়, অবশেষে ভীত। অনেক চেষ্টা করে ভয়কে দূরে সরিয়ে দেয়। তারপর নিজের আত্মার কাছে মাথা নত করে নিজেকে দেখবার জন্য, চিনবার জন্য চোখ বন্ধ করে, প্রাচীন ঋষিদের মত অনেকক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকে। চর্মচক্ষুকে সংযত করে অন্তর্মুখী করে। অন্ধকার, ঘনকৃষ্ণ

বিপুল। অন্ধকারে একা কে যেন চলছে। তখনই শ্যামল ভীত হয়। ভয়ে কথা বলতে চায়। বুকে শব্দের বাণ নিক্ষেপ করে বীরের মত শ্যামল বোদলিয়র অথবা রবীন্দ্রনাথের আরোগ্য কাব্য থেকে আবৃত্তি করে। চেঁচিয়ে পাগলের মত, উল্লাস কণ্ঠে।

মাঝে মাঝে মোমের শিখা কেঁপে উঠছিল।

শ্যামল আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে—মঙ্গল দেখত কাঁচের জারে ঐ পোকাটা মরে গেছে, না বেঁচে আছে?

এমনি সময়ে চটিতে শব্দ তুলে আলোর দীর্ঘ ছায়া ঘরে প্রবেশ করে। মঙ্গল ঘর থেকে বের হয়ে যাবে, সে সময় আলো বলে—রেখে দে।

মঙ্গল শ্যামলের জন্য ফলগুলো রেখে দিয়ে চলে যায়।

শ্যামলের পাশে আলো বসে। পত্রিকা-কাগজের ঠোঙা থেকে একটি কমলালেবু বের করে আলো। সে সময় শ্যামল দেখল, আলোর নিটোল নাক মোমের আলোর স্পর্শে খোদিত। কমলার খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে আলো উজ্জ্বল চোখে বললে,—জান শ্যামল আমি সৌভাগ্যবতী আমার হাত দেখে পরেশবাবু বললেন আমার বিয়ে হবে বড় ঘরে। স্বামীর অনেক পয়সা। ব্যবসায়ী। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, অফিসার, আর কত কি পাগলের মত বলে গেল।

বলেই আলো হাসছে, শুধু হাসছে। নিজেকে সামলাতে না পেরে একহাতে কমলা অপর হাতে একটা কমলার কোওয়া নিয়ে শ্যামলের বুকের কাছে পরে যেতেই শ্যামল হাত দিয়ে ধরে বুকে চেপে রাখল আলো-কে। আলো নড়ল না, কাঁপল না এবং কমলার কোওয়াটিকে হাত দিয়ে তুলে শ্যামলের মুখে গুঁজে দিল। শ্যামল মুখে কমলার টুকরো নিয়ে অস্পষ্ট ভাবে বলে—সে ত ভাল কথা এ বাজারে একটি সুশ্রী শিক্ষিতা পাত্রীর ভাগ্যে যে....

আলো উত্তর দেয়—দেখ, শ্যামল, একসময় ছিল মেয়েরা পরভৃতিকাকে হিংসা করত। ওভাবে বেঁচে থাকা মেয়েদের যে কি যন্ত্রণা, যেমন যন্ত্রণা ইংরেজদের গোলামী হয়ে থাকা। আমরা কেন ক্রীতদাসী হব। আমরা কি এখনও অবলা, অক্ষম, গরুর চোখের মত অসহায়। আমি চাই, ঠিক এমনি এক পুরুষের বাহুবেষ্টন। আমি চাই তোমার মত একজোড়া তীব্র এবং স্নিগ্ধ চোখ। আমি চাই সেই পুরুষকে যে আনন্দের জন্য, ভালবাসার জন্য কষ্ট সহিষ্ণু হবে। যে পুরুষ কাজ করে করে ক্লান্ত হয়ে পাখীর মত নীড়ে ফিরবে। আমি তার ক্লান্ত শরীর বুকে তুলে নেব।

আলো শ্যামলকে ছেড়ে দিয়ে বলে—আমি জানি আমার মত স্বাস্থ্যবতী, সুশ্রী, দীর্ঘাঙ্গি এবং শিক্ষিতা মেয়ের ভাগ্যে এ যুগে সুনিয়ন্ত্রিত। কিন্তু আমার স্বাস্থ্য, আমার সৌন্দর্য্য, আমার শিক্ষা, আমারই। আমার অহংকার আমার গর্ব। আমার অহংকার থাকে খুসী আমি দেব। ওখানেই আমার স্বাধীনতা, একজন নারীর মর্য্যাদা।

শ্যামল উত্তর দেয়—বুঝলাম তোমার কথা। কিন্তু দেবেটা কাকে শুনি। সাধারণত মেয়েরা যা চায়, মেয়ের মা-বাবা যা চান, তাদের যা আকাঙ্ক্ষা, বড় ঘরে বড় পাত্রে, যার অনেক টাকা, যে সুখে রাখতে পারবে। এবং যা সত্য যা বাস্তব।

আলো উঠে বসে। তক্তপোষ থেকে নামে। ষ্টোভ বের করে আনে। এরপর কথা বলে—মায়েরা কোনদিন স্বাধীনতার স্বাদ বুঝল না, মুক্তির আনন্দ যাদের ইচ্ছায় কোনকালে দেখা যায় নি, যারা শুধু অন্যের অর্থের বিনিময়ে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য চেয়েছে তারা কি করে সত্যকে বাস্তবকে বুঝবে। মায়েদের ভিতরের যন্ত্রনার কথা, স্বামীর অত্যাচারের কথা, আর অকথ্য ইতর গালিগালাজ কে বলবে। পূর্বকালের মায়ের জাত এগুলোকে সহ্য করেছে,

প্রকাশ করেনি। শুধু প্রকাশ করেছে, স্নিগ্ধ সিঁদুর, হাতভরা স্বর্ণবলয় আর শ্বেত শঙ্খের শাঁখা। এগুলো যন্ত্রনার মুখোশ।

শ্যামল শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে—তোমার কল্পিত যে পুরুষকে তুমি স্বপ্ন দেখছ সেই বা তোমার অহংকারকে নেবে কেন? তুমি কি বুঝতে পারছ না, তোমার দান দিয়ে তুমি অপরকে বন্দী করে ফেলতে পার।

আলো ষ্টোভ ধরায়। হঠাৎ আলোর ঝলকানি ওর মুখখানাকে উদ্ভাসিত করে দেয়। ওকে আরও সুন্দর মনে হয়।

আলো শ্যামলের প্রশ্নের জবাব দেয়—নিশ্চয়ই নেবে না। পৌরুষকে বিসর্জন দিয়ে নারীর স্বাস্থ্য ও রূপের মোহে বন্দী হবে, এর চেয়ে ঘৃণ্য জীবন পুরুষের আর কি হতে পারে। ছেঃ ছেঃ।

ষ্টোভের উপর চায়ের জল ছোট এনামেলের ডেকচিতে চাপিয়ে আলো হঠাৎ তীব্র কণ্ঠে বলে যায়—কেন? কেন? কেন ডাক্তার নির্মল লাহিড়ী, অধ্যাপক অমল চক্রবর্ত্তি, সাংবাদিক পরেশ গুপ্ত আরও অনেক যুবক আমার চারদিকে ঘোরা ফেরা করে? শুধুই গার্ল ফ্রেণ্ডশিপের জন্য? মিথ্যা। বন্ধুত্বের মুখোস পরে এরা শ্বাপদের মতো এগোয়। জান শ্যামল, ওরা পারলে আমার দেহটাকে যেন ছিনিয়ে নিতে চায়, লুব্ধ দৃষ্টিতে আমার পোষাকের দিকে তাকিয়ে থাকে। পুরুষের চরিত্র বুঝবার জন্যই আমি ইচ্ছা করে অশ্লীল পোষাক পরি। যত্তসব অসংযত, কামুক, কাপুরুষ।

আলো থামে। নিশ্বাস নিয়ে আবার বলে—মেয়েদের জীবন এত সস্তা ভেবেছে। তাহলে বেশ্যা সৃষ্টি হয়েছে কেন? টাকা খরচ করলেই খুশী মতো যৌবন কিনতে পাওয়া যায়। সেখানে যেতে পারে না। নাকি পচা ডিমের মত বেশ্যার যৌবন দেখে ভয়? নষ্ট যুবকের আবার ভয়? তাই ভদ্র ঘরের মেয়েদের সর্বনাশের চেষ্টা।

শ্যামল আরও শান্ত কণ্ঠে বলে—হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে কি যা তা

বলছো। আলো, আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না। ধারাকম্প কণ্ঠে শ্যামল বলে—আমিও একদিন সুনন্দা, দীপা, মঞ্জু ওদের সাথে মিশেছি।

আলো তীব্র কণ্ঠে উচ্চারণ করে—ওরাই তোমার কাছে এসেছিল গোপনে, তোমার ভিতর প্রচ্ছন্ন বিরাট অহংকারের রূপ তারা সহ্য করতে পারে নি। তাই ওদের ভিতর কেউ তোমাকে ভালবাসতে পারে নি। উপরন্তু তোমাকে বিদ্রূপ করতো আর্থিক অসচ্ছলতার সুযোগ নিয়ে।

আলো চায়ের জল নামাল। একটি কাঁচের গ্লাস ও কাপ বের করে আনে কাঠের সেলফ থেকে। আলোর মুখে গরম জলের শুদ্ধ বাষ্প।

আলো নরম কণ্ঠে কথা কয়—জানো শ্যামল দুটো অহংকার, দুটো দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় একত্রে মিলে সৃষ্টি করে নিটোল একটি বৃহৎমন অর্থাৎ একটি পবিত্র ভালবাসা। কিন্তু সংসার তা হতে দেয় না বলেই যন্ত্রণা।

শ্যামল—কিসের অহংকার? আলো—মানবতাবোধের।

শ্যামল জবাব দেয়—ঠিক বলেছ। আসলে জীবন সহজ। জীবন থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত যে বিরাট ফাঁক তা কর্ম দিয়ে এবং ভালবাসা দিয়ে পূর্ণ করে দাও। তারপর যন্ত্রনাদগ্ধ মায়ের মত শান্ত মৃত্যুর কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়। তা না ভেবে সমাজে আমার স্থান কত উঁচু আর কত নিচু সে প্রতিযোগিতায় নেমে নিজেকে সংকীর্ণতায় আর জটিলতার আবর্ত্তে ফেলে যন্ত্রণায়, কাপুরুষতায়, প্রতারণায় অযথা কষ্ট পাই কেন?

অবশেষে আলো চা করল। হরলিকস্‌ও।

ষ্টোভে আবার ছোট্ট ডেকচী বসিয়ে দেয়। জল ঢালে ডেকচিতে। শব্দ নেই, জল ফুটছে। শ্যামলকে হরলিক্‌স দেয়। চা-এর কাপ নিয়ে শ্যামলের পাশে বসে।

কাপে চুমুক দিয়ে আলো বলে—আজ কোথায় গিয়েছিলাম জান? শান্ত আকাশের দিকে চোখ রেখে যেমন কথা বলে তেমনি শ্যামল বলে—বল, শুনি।

শ্যামলের চোখের দিকে মুখের দিকে তাকায় আলো।

তখন শব্দ নেই, জল ফুটছে। তখন শব্দ নেই, মোমের শিখা কাঁপছে। তখন শব্দ নেই, আলো কাপ থেকে চা টেনে নিয়ে বললে—আজ তোমাকে অনেক কথা বলবো শ্যামল।

শ্যামল, মনে হল নির্জনদ্বীপে পাখীর দিকে চোখ রেখে বলল—বল, শুনি।

আলো কয়েকমুঠো চাল ধুয়ে ডেকচিতে ছেড়ে দেয়। শ্যামলের ঘনিষ্ঠ হয়ে আলো কথা কয়—কবি এবং সাংবাদিক পরেশ গুপ্তের সাথে ডায়মণ্ডহারবার গিছলাম। বিদেশী কবিতা পড়ে কবিতাকে জন্ম দেয়। অথচ জীবন-মন্থন করতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। আরতী নামে এক পিতৃহীন মেয়েকে দুবছর ধরে বলে আসছে বিয়ে করবে। অথচ আমি এককথায় নিয়ে যাই ডায়মণ্ডহারবারে।

হরলিকস্ দেখল আলো, শ্যামলের শেষ হল। গ্লাস নামিয়ে রাখে আলো। শ্যামল বলে—বেশ নাটকীয়, তারপর।

আলো কথা কয়—অমল নামে এক অধ্যাপক। সেও ঢাকুরিয়াতেই থাকে। শুনেছি পাড়ায় কোন এক মেয়েকে নিয়ে সৃষ্টি করেছিল কোন এক নিষ্ঠুর অতীত। মেয়েটি আত্মহত্যা করেছিল। আমাকে পড়াবে বলে আমাদের বাড়িতে আসে। আমার মুখের দিকে বুকের দিকে তাকিয়ে থাকে। পড়ায় ঘোড়ার ডিম।

আলো শব্দ না করে শেষ চুমুক দিল চা-এ।

শ্যামল আলোর দিকে তাকিয়ে বলে—বিচিত্র তোমার জীবন। শ্যামলের গলার কণ্ঠে আলো হোঁচট খেয়ে থেমে গেল। একটি গোপন ব্যথায় শরীরটা চিন্ চিন্ করে উঠল। কিসের ব্যথা

বুঝতে পারল না। ভাবল, ও কিছু নয়। একটা সংস্কার। এই ভেবে সে শ্যামলের একটা হাত নিজের হাতের মুঠোয় ধরে চাপ দিতে দিতে বললে—আরো আছে, শুনে যাও। এরপর তুমি যদি আমাকে ঘৃণা কর শাস্তি দিও। আর না কর, বুকে টেনে নিও। কারণ গোপনতার যন্ত্রনা ভয়ানক। প্রকাশে আনন্দ। আমি ত তাই বুঝি।

আলো বুঝল শ্যামলের হাতে এখন কোনও উত্তাপ নেই।

আলো আবার বলতে সুরু করে—ডাক্তার নির্মল লাহিড়ী, অসিত দত্ত, প্রতাপ সেন এবা সব আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছিল একদিন। শুধু আমার কেন, আমার পরিবারের। বাবার মৃত্যুর পর ওদের যাতায়াত আরও বেড়ে গেল। মা কিছুই বলতেন না। বরং আমি মাঝে মাঝে বিরক্তি বোধ করতাম। প্রতাপ ও অসিত চাকরী পেয়ে চলে গেল বাংলার বাইরে।

শ্যামল, যেন বিচারক বলছেন, বললে—তুমি এ ভাবে কেন মিশতে ?

কার এই গুরু কণ্ঠস্বর ? হঠাৎ আলো চোখ বুজল। একরাশ অন্ধকারে কয়েকটি ছিটে ফোটা আলোর দাগ ছুটোছুটি করছে। আলো স্পষ্ট উত্তর দিল—অভাবেব সংসারকে বাঁচাবার জন্য এবং একজন সম্পূর্ণ পুরুষকে পাওয়ার নেশায়। কিন্তু পেলাম না। পেলাম তাকে যার সাথে কোনদিন মিশলাম না। সত্যকে যুক্তি দিয়ে যাচাই করে পাওয়া যায় না, সত্য তার আপন পথে চলে, আপনি এসে দেখা দেয়। তারপর তাদের কাছ থেকে —না, না শ্যামল আমি আর বলতে পারছি না।

আলো বিছানায় উপুর হয়ে পড়ে গিয়ে কাঁদতে সুরু করে। মাথার একরাশ ঘনচুল প্রশস্ত পিঠে তিন থাকে ভেংগে পড়েছে। কান্নায় আলোর প্রশস্ত পিঠে ভূমিকম্পের মৃদু আলোড়ন।

শ্যামল পিঠে হাত রাখে অনেকক্ষণ পর।

বললে—যদি কষ্ট হয় আজ থাক। আর একদিন বলবে।

আলো ওভাবে থেকে জবাব দেয়—আমাকে বলতে হবে।

শ্যামল উত্তর দেয়—কিন্তু তুমি যে বলতে কষ্ট পাচ্ছ।

আলো আবার উঠে বসে। শ্যামল ওকে কাছে টানে। ডান বাহু দিয়ে আঁকড়ে ধরে এবং আলো-কে বুকের কাছে নিয়ে আসে।

আলো বলে ধীরে ধীরে ভেজা স্বরে—তোমার এই বাহু বেষ্টনে আমার কোন কষ্ট নেই। তোমার অসুখের খরচ চালাবার জন্য আমি ওদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতাম। প্রেমের অভিনয় করতাম। আমার মা পরীক্ষার জন্য টিউশনি করতে দিতেন না। আর সন্ধ্যে বেলা লুকিয়ে করতে পারতাম। তোমার কাছে আসব বলে করতাম না।

শ্যামল ডানহাতে ব্যথা অনুভব করল। ডানহাতটায় যেন ঝিন্ ঝিন্ ধরেছে। সে ডানহাত সরিয়ে আনতে চাইল আলোর বুকের উপর থেকে। কিন্তু এই মুহূর্তে সে কি করে আনবে। একটি শাশ্বত মুহূর্ত। অনেক মুহূর্তের মধ্যে একটি উজ্জ্বল মুহূর্ত। একটি নিষ্ঠুর মুহূর্ত, অথচ মুক্ত। মুক্তপ্রাঙ্গনে জীবন হারিয়ে যায়, ধরা যায় না, অথচ জীবনকে নিয়েই সংসার। ক্রমশ শ্যামলের হাত শিথিল হয়ে আসে। আলোর জীবন যেন বলছে, আমাকে ধরে রাখবার তোমার ক্ষমতা কোথায়? আমি যে বিশাল, আমি যে মুক্ত, আমি যে সংসার থেকে অনেক দূরে।

শ্যামলের হাত ঠাণ্ডা হয়। সে চেষ্টা করেছিল আলোর স্তনকে ডান হাতের মুঠোয় ধরে রাখতে, পারল না। চেষ্টা করেছিল ব্লাউজের কাপড় আঁকড়ে ধরতে, পারল না। অবশেষে আলো শ্যামলের ছড়ানো পায়ের উপর ঢলে পড়ল।

৷৷ আট ৷৷

শ্রেণীবদ্ধ পাখীর নীড়ে ফেরার সাথে সাথে আকাশ ভরা রোদ্দুর প্রকৃতির অন্তরালে চলে যায়। ঠিক সেইমুহূর্তে নির্জনতার অতি নিকট দিয়ে একটি মালগাড়া ভয়ংকর শব্দ করে চলে গেল বিবেকানন্দ ব্রীজের উপর দিয়ে। শব্দ অতিক্রান্ত এবং আতঙ্কিত কয়েকটা পাখীর চীৎকারকে বাতাসে ছড়িয়ে দেয়। পাখীরা উড়ল আবার গাছে ফিরল।

নরেশবাবু বাবলুর হাত ধরে ঘাটে এসে পৌঁছলেন। দেখলেন অনেক লোক। কেউ নৌকো থেকে নামছে, এসেছে বেলুড় মঠ থেকে। আবার কেউ নৌকোয় উঠছে, যাবে বেলুড় মঠে।

নরেশবাবু বললেন—চল নৌকো করে বেড়িয়ে আসি। সেই বাগবাজারে নামব। ওখান থেকে বাড়ি যাব। ভাল লাগবে।

নরেশবাবু কয়েকটা সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকে নামলেন, পেছনে বাবলু। নরেশবাবু বাবলুর নরম হাতের তালু ধরে আরও কয়েকটা সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকে নামলেন। নরেশবাবু কথা বলেন না, কাজ করেন। ছোট একটি নৌকো ভাড়া করেন। মাঝি নৌকার গলুই সিঁড়ির কাছে নিয়ে যায়। নরেশবাবু বাবলুকে কোমর ধরে শূন্যে তুলে নৌকায় উঠিয়ে দেয়। লোকের ভীড়ে বাবলু লজ্জা পায়। অদূরে ওর বয়সী একটি মেয়ে মায়ের হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল। ও রকম একটা অস্বাভাবিক কাণ্ড দেখে হাসল। নরেশবাবু নৌকোয় উঠলেন। তিনি সামান্য হাঁফাচ্ছেন। রমণীয় প্রশান্ত গঙ্গার উপর দিয়ে নৌকো ভাসে। স্রোতের মুখে এগোয়। মাঝি পথ নির্দিষ্ট করে এগিয়ে নিয়ে যায়।

ভেতর থেকে মাঝির রোগা কালো পাদুটো ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। বাইরে ডান হাত দিয়ে বাবলুকে নরেশবাবু বেষ্টন করে আছেন। নরেশবাবুর দৃষ্টি তখন কাঁচা আঁধারে পুষ্ট দিগন্ত প্রসারিত প্রকৃতির অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। অন্ধকার ঘরেতে মৃত প্রকৃতির আতঙ্কিত গন্ধ।

নৌকো এগোয়, এগোতে হয়।

নরেশবাবু বাবলুর গালে হাত রেখে বাবলুকে আদর করেন। গঙ্গার বুকে ঢেউ নেই, নেই উচ্ছ্বাস। দুরন্তপনা নেই, নেই ভীষণতার রূপ। যন্ত্রের শব্দে আয়ুর ভাবনা নেই। মাঝে দাঁড়ের শব্দ এবং দাঁড় দিয়ে জল কাটার শব্দ।

নরেশবাবু বলেন—চল ছাউনির ভিতর বসি গিয়ে। নরেশবাবু বাবলুকে নিয়ে ছাউনির ভিতর ঢুকলেন। ছাউনির ভেতর, ধারে একটা লম্বা চওড়া ময়লা ছেঁড়া কাপড় গোঁজা। তিনি ওটা টেনে বের করলেন।

নরেশবাবু দলাপাকানো ন্যাকড়া খুলে ফেললেন। মাঝির ধারে ছাউনির মুখের দিকে অনেকটা ঝুঁকে ফাঁকটুকু বন্ধ করে দেবার জন্য ন্যাকড়া কাজে লাগালেন। হাত কাঁপছিল। বিশ্বস্ত বাবলুর চোখ থেকে নিমেষে গঙ্গা এবং গঙ্গার লাবণ্য দূর হল। সে শুধু কাকার কাজ দেখল। ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করল। বুঝতে পারল না। একটা কিছু কারণ খুঁজে বের করবার জন্য সে অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারছে না। নরেশবাবু শুয়ে পড়লেন। পাশে বাবলুকে শুইয়ে দিলেন। কৌতুহলের বিশালপুরাতে গিয়ে বাবলু স্তব্ধ, বিস্মিত। কথা আটকে গেছে। নরেশবাবু বাঁ কাত হয়ে শুয়েছিলেন। বাবলুকেও সামনে রেখে বাঁ কাত করে শুইয়ে দিলেন। বাবলুকে বুকের কাছে এনে পা পর্যন্ত বাবলুকে কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। বাবলু

ক্রমশ শামুকের মতো গুটিয়ে যাচ্ছিল লজ্জায় এবং ঘৃনায়। নরেশ-বাবুর নগ্নতার স্পর্শ বাবলুকে ঈশ্বর সমীপে বলি দেওয়ার জন্য স্থাপিত করা হয়েছে, বাবলু বুঝল। এখন সে আর মাতা কালীকে স্পৃষ্ট উপলব্ধি করতে পারছে না। বাবলু ভাবল, এই লোকটার কি স্ত্রী মৃত? সে কি বেশ্যা বাড়ি যেতে পারে না?
ক্রমেই বাবলু প্রতিশোধস্পৃহ হয়ে উঠল। বাবলুর চোখের সম্মুখে যে ঘন অন্ধকার সেখানে কতকগুলো কুৎসিৎ এবং বিষণ্ণ স্বপ্ন ঘুরে বেড়াতে থাকে। বাবলু আতঙ্কিত হয় না। বরং সে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এগিয়ে চলে। এগিয়ে যায়। স্থির করে সে এগিয়ে যাবে। বাবলুর মনে হল না, সে গঙ্গার উপর নৌকোতে আছে। সে বুঝতে পারল না, ওর মাথার উপর গম্ভীর আকাশ, অনেক নক্ষত্র। জ্বলছে।

॥ নয় ॥

আলো দেখল, চক্রবর্ত্তীদের একতলা বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরের জানালা থেকে নিয়নের আলো রাস্তার উপর শায়িত। পাংশু আলো মাড়িয়ে আলো এগিয়ে গেল। লাইটপোষ্টের ডুমের চার পাশে কয়েকটি মৃতের মত ধূসর পোকা স্তব্ধ। আলো বাড়ীতে এসে পৌঁছল। দেখল বাইরের ঘর অন্ধকার। ভাবল, বাবলু ফেরেনি। কি ভেবে আলো সামনের দরজার কড়া নাড়ল না। পেছনের দিকের দরজায়, চটিতে শব্দ না তুলে গেল, অন্ধকার মাড়িয়ে। শব্দ না করে দরজায় হাত রেখে চাপ দেয়। দরজা খুলে যায়। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে। শব্দ হয় না। অন্ধকার দেয়ালের আলসেতে দাঁড়িয়ে আলোর আদুরে বিড়াল এসব লক্ষ্য করছিল। বিড়ালের চোখদুটো, আলো লক্ষ্য করল, জ্বলছে। কি ভয়ানক। আলো শাড়ির আঁচল বুকের কাছে জড়িয়ে আনে। এগোয়। দেখতে পায়, মার ঘরে আলো। দরজাটা ভেজানো। এক চিলতে ফাঁক। ফাঁক বেয়ে মেঝেয় আলোর দীর্ঘ রেখায় দেখতে পায়, ঘরের ভেতর দুটো ছায়া নড়ছে। হয়ত যাদবকাকা। কিন্তু কথা নেই। বরফের মত নীরব। বিড়াল মার ঘরের দরজার, নিকট দাঁড়িয়েছে। লেজটা উপর দিকে তুলে দিয়েছে। শব্দ করছে না। আলোর দিকে তীব্র দৃষ্টি। বিড়াল চললে শব্দ হয় না। এখন আলোর মনে হল, বিড়ালটা কয়েক সপ্তাহ আগে মা হয়েছে। সে আলোকে অনেক আগেই চিনতে পেরেছে। আলো বিড়ালটা ধরতে গেল জানালার নিচে। শব্দ হল না। বিড়াল পালিয়ে গেল। সেই মুহূর্তে আলো সোজা হয়ে দাঁড়াতেই জানালার ফাঁকটুকু দিয়ে দেখতে পেল মাকে, যে প্রায় শিথিল অবস্থায় চীৎ হয়ে শুয়ে আছে এবং পাশে শায়িত যাদক কাকা মাকে বাহু বেষ্টনের ভেতর রেখে মায়ের বুকে মুখ গুঁজে পড়ে আছে ষাঁড়ের মত। এরূপ ভীষণ নাটকীয় এবং অশ্লীল দৃশ্যে আলোর হৃদয় অত্যাচার সুরু করে দিয়েছে। এ অত্যাচার

পরেশের এবং ইত্যাদি যুবকদের কামনার লোল জিহ্বার ঘৃণ্য শিহরণ নয়। আলো ভীষণ চীৎকার করে বলে উঠল—দরজা খোল মা। সেই মুহূর্তে এক ঝাঁক সাদা পায়রা আলোর সুকুমার হৃদয় থেকে উড়ে গেল নীল আকাশের নীচে। সে আবার বলল চেঁচিয়ে—দরজা খোল। দরজায় কিল মারছে। দুম্ দুম্ দুম্ দ্রুতশব্দ।

অপর্ণা দরজার শব্দ এবং আলোর প্রকট কণ্ঠস্বর শুনতে পেযে পা দিযে যাদবকে দূরে ঠেলে দিয়ে উঠে পড়ল। বল্লে নিম্ন কণ্ঠে—কাপড়টা ঠিক করে নাও।

যাদব মাথা তোলেন। এমন ধীরে মাথা তুললেন; যেন মনে হল, প্রার্থনা করলেন, ঈশ্বর আমি চলতে পারছি না। শক্তি দাও আমি এগিয়ে যাব।

চচ্চু চচ্চু, যাদব যদি এরূপ প্রার্থনা করতে পারতেন তাহলে ঈশ্বর করুণা করতেন এবং যাদব বুঝতেন বিধবা অপর্ণার পরিপুষ্ট স্তন এবং দেহ থেকেও কামনার অন্য বস্তু আছে। সেই স্তন এবং দেহ আরও পরিপুষ্ট, আরও বিশাল, আকাশের মত, মেঘের মত। মনের নির্জনদ্বীপে সেই স্তনে সূর্য্যবিন্দু রক্তের মত প্রবহমান। সেখানে অপর্ণা এবং অপর্ণাকে কেন্দ্র করে সভ্য কামনার কারখানা কত ক্ষুদ্র, পোকার মত উকুনের মত নখেতেই মেরে ফেলা যায়।

অপর্ণা ব্লাউজ পরলেন। দরজা খোলেন। বলেন—চেঁচাচ্ছ কেন? পাড়ার লোক ভাববে কি।

আলো মার দিকে তাকায় না। আলোর চারু চোখ বিদ্রোহে দীপ্র। সে এগোয় যাদবের দিকে। থামে। তীব্র কণ্ঠে বলে—বের হয়ে যান্। ঘর থেকে বের হয়ে যান্। যদি না বের হোন পাড়ার লোক ডেকে ঘর থেকে বের করে দেব।

আলোর দ্রুত নিশ্বাসে বাতাসের পুনর্জন্ম ঘটল এই ঘরে। যাদবের সকল কথা রক্তশূন্য। উচ্চারিত হতে পারছে না। ধীরে সুস্থে নেমে এলেন তক্তাপোষ থেকে তিনি। হৃদয়ে গভীর ক্ষত, তার

গোপন যন্ত্রনায় কালো স্থূল দেহটা বিধ্বস্ত। মৃত পশুর মত বিধ্বস্ত দেহটাকে বহু কষ্টে টেনে নিয়ে হাঁটতে চেষ্টা করেন।

অপর্ণা বললেন—আলো এসব কি বলছ। তুমি কি জান না, তোমার বাবার মৃত্যুর পব তোমার এই কাকাই সংসারের অর্ধেক চালাচ্ছেন। তুমি তাকে এভাবে—,

আলো মার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। ওর চোখ জলে আক্রান্ত। কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে উঠেছে। কণ্ঠনালী কাঁপছে। সেরকম মুহূর্তে সে জানালার একটি পাল্লা শক্ত কবে ধবে সহজ হয়ে বললে—মা, তুমি আবার ঐ র‍্যাসকেল্‌টার পক্ষ নিয়ে কথা বলছ। ওকে যেতে দাও, ও যেন আর এ বাড়ীতে না আসে।

দবজার কাছে গিয়ে যাদব শেষবার তাকান অপর্ণার দিকে। সেই দৃষ্টিতে জন্তু জানোয়ারের মতো একটি অতি পবিত্র সরল ভালবাসার ভাষা ছিল। অপর্ণা কন্যার কথায় উত্তর দেন—আমি তোমাব বাবাকে কোন দিনই ভালবাসতাম না। তোমার বাবার মতো অত্যাচারী পশুর কাছে শুধু আমার কর্ত্তব্য ছিল, ভালবাসা ছিল না।

কথার আগুনের তীব্র যন্ত্রনাকে সহ্য করতে না পেরে আলো তীব্র কণ্ঠে উচ্চারণ করে—তোমার মত বেশ্যার মুখে এ কথাই শোভা পায়, জানলুম।

আলো ঘর থেকে দ্রুত বের হতে চেষ্টা করে।

অপর্ণা হাতের কাছে পেলেন একটি কাসার বাটি। আলোর দিকে ছুড়ে মারলেন—তোর এতবড় কথা। আমার এ বাড়ি থেকে বের হয়ে যা। এক্ষুনি বের হয়ে যা। চলে যা। যেখানে খুসী যা। মরগে। তুই আমাকে বলিস্‌ বেশ্যা। তুই কিরে হারামজাদী। আমি না তোর মা।

কাসার বাটিটা কপালের পাশে সামান্য স্পর্শ করে মেঝেয় পড়ল। একটা ভয়ংকর শব্দের সাথে সাথে আলো আর্ত্তনাদ করে উঠল—বাঃ বেশ। এইতো মায়ের মতো কথা বোলছ। এই যাচ্ছি।

• আলো যাবে। সম্মুখের দরজা খুলে এগোবে আলো। পেছনের দরজা দিয়ে শুকনো পাতার মত মাথা নীচু করে চলে গেছেন যাদব সরখেল। আলো বৈঠকখানার ঘরে গিয়ে দরজার ছিটকরি খুললো। বাইরে দেখল বিশাল অন্ধকার। লাইটপোষ্টের হলুদবর্ণ আলো, ভালবাসার প্রোজ্জ্বল স্পর্শে স্নিগ্ধ, কোমল। অন্ধকারের সিঁড়ি ভেঙ্গে আলোর মন স্বর্গে ধাবমান। খুঁজে দেখতে হবে স্বর্গে কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা একটি মুখ, অত্যাচারী, পশুর মতো হিংস্র, আলোর বাবা। আলো স্বর্গের পথে পা বাড়ায়। শ্যামল শ্যামল শ্যামল। এমনি সময় বাবুল দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে দিদির কাছে এসে দাঁড়ায়। দিদির হাত ধরে। বলে, কোথায় যাচ্ছ? চল ফিরি।

বাবলুর চোখে যেন ঝড় লুকিয়ে আছে, একটা ভয়ানক বিপদ। আলো বলে—ফিরব না। তোমার কি হয়েছে বল।

ওরা দুজন এখন অন্ধকার পথে।

বাবলু কেঁদে ফেলে। বলে—ওই তান্ত্রিকটাকে দূর করে দাও। মাকে বলে ওকে দূর করে দিতে হবে। অসভ্য একটা জানোয়ার।

বাবলুর কথার ধরণে আলো বুঝতে পারল, কেন তান্ত্রিক বাবলুকে ভালবাসত, অনেক কিছু উপহার দিত, অযথা অর্থ ব্যয় করত। ঈশ্বর এই পৃথিবীতে কত বিচিত্র লোকের বসবাস। আলোর মন মানব হৃদয় ছুঁয়ে পৃথিবী পরিক্রমা করে।

একদিন ছিল তান্ত্রিক, আজ সে জানোয়ার। একদিন ছিল মা, আজ সে গণিকা। একদিন ছিল বুদ্ধিমান মেধাবী ছাত্র, আজ সে নারীদেহ লোলুপ। আমাদের দেহমন স্থির নেই নিত্য রূপান্তরিত হচ্ছে। আজকের আমি আর কালকের আমি-তে অনেক তফাৎ। যা দৃষ্টি তা যুক্তি দিয়ে বলা যায়, যা অদৃষ্ট তা কেমন করে আসবে, কে জানে। অথচ প্রাচ্যঋষি উপদেশ দেন, যা স্থির তা সত্য। ঈশ্বর স্থির, তাকে কল্পনায় স্তব্ধ মূর্ত্তি গড়িয়ে পূজো কর। মূর্ত্তি না গড়াও, ক্ষতি কি? মন্দিরে তপস্যা কর অথবা অরণ্যে,

প্রান্তরে, পর্ব্বতে অথবা নির্জন মানুষের মধ্যে খোঁজ। মানুষের মনের গভীরে পরিবর্ত্তন নেই, রূপান্তর নেই। প্রায়শ পরিবেশে অস্থির হয়ে ওঠে মানুষ। তখন সে লৌকিক, অলৌকিক নয়।

এরকম ভাবতে ভাবতে আলো বলে—বাবলু আমরা পরিবেশের দাস। পরিবেশ থেকে মুক্ত হতে পারলে আমরা আমাদের মনকে নিজেদেরকে চিনতে পারব। চল, আমরা আবার মায়ের কাছে ফিরে যাই।

অমৃত আঁধারের বুকে পা ফেলে ফেলে ছোট ভাই দিদির হাত ধরে মায়ের দুয়ারে আঘাত করে। দরজা খোলাই ছিল অদূরে স্তিমিত মার ঘরের আলোয় মৌন বিষন্নতার ছায়া। করুনার নিরর্থক আবেদনে অশুদ্ধ ঘরটা, আশ্চর্য্য, বরং স্তম্ভিত। ঘরের নৈঃশব্দ যেন অতি বৃদ্ধ। প্রাজ্ঞ বাবলুর বুকে আতঙ্কের মৃদু আঘাত। বাবলু শিশিরের শব্দে চোখ তুলে ভীত কণ্ঠে দিদিকে বলে—মার ঘরে কোন আওয়াজ হচ্ছে না কেন রে? বৈঠকখানার ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে বাবলুর গালে দুহাত রেখে আলো উত্তর দেয়—তার চেয়ে আমরা আজ এ ঘরে বসি। এখানেই আজ রাতটা কাটিয়ে দেব। কেমন?

জলের বিন্দু আলোর চোখে।

বাবলু বলে—তুই বুঝি মার সাথে রাগ করেছিস। ঠিক আছে, যাব না, দেখিস, মা আমাদের ডেকে নিয়ে যাবে।

আলো বাবলুর নরম কথাগুলো শুনল এবং মনে করল বাবলুর পিতা ছিলেন একদা অত্যাচারী, পশুর মতো। বাবলুর রক্ততে তাহলে লুকিয়ে আছে ক্ষুধার্ত শ্বাপদ! আজ বাবলুর কথাগুলো হরিণের ডাগর চোখের মতো, আগামী কাল হয়তো কথাগুলো দরজায় আঘাত করার মতো হবে। কিন্তু নাও হতে পারে। বাবলু ধ্রুব মনকে জানে হয়তো আজ বাবলু বলে দিদির কপালে হাত দিয়ে—ইস্ অনেকটা ফুলে গেছে, মা বুঝি মেরেছে।

অবশেষে দিদির হাত ধরে টেনে বললে—চল মায়ের কাছে যাই। মা কেন তোমাকে শুধোশুধি মারলে?

বাবলুর দীপ্ত চোখে মায়ের প্রতি কোনরূপ ঘৃনাজনিত ছায়া পড়েছে কি না আলো লক্ষ্য করল। এবং বললে—তুই যা আমি রইলাম। বাবলু উঠল। দু পা এগিয়ে বললে—তাহলে তুমি বস, আমি মাকে নিয়ে আসছি।

ঘর ছেড়ে ভিতরের দিকে চলে গেল। দ্রুত হেঁটে মার ঘরের দরজার কাছে পৌছল। একবার তান্ত্রিকের ঘরের দিকে তাকাল। ঘর অপরিচ্ছন্ন অন্ধকারে ডুবে আছে। বাবলুর ধারণা, তান্ত্রিক ফিরে আসেনি। ফিরে এলে, সে মাকে বলে এ বাড়ী থেকে চলে যেতে বলবে। বাবলু মার ঘরের দরজা খুললো। বিড়ালটা ওর পায়ের কাছে। এক দরজা ঘরের আলো বাবলু ও বিড়ালের গায়ে এসে পড়ে। বাবলু ঘরে প্রবেশ করে। শব্দ হয় না, শব্দ নেই। দেখে, মা খাটের উপর শুয়ে আছে। মায়ের বুকে একটি ফটো। এই ফটো বাবলুর মুখস্থ, ওর পিতার। মার খাটের পাশে টাঙানো থাকে। এরকম একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি দেখে বাবলু বিস্মিত, তারপর আতঙ্কিত। মৃদু পায়ে আসে অপ্রস্তুত মনে। বাবলু সন্তর্পণে এগোয়। বিড়ালটা পায়ে পায়ে আসে। দেখে বাবলু, একটি কাঁচের গ্লাস। গ্লাসের ডানপাশে একটি শিশি। শিশির গায়ে লাল কঙ্কালের মাথা। মাথার উপর Poison। কয়েক বছর আগে বাবার অসুখের সময় এই ওষুধ আনা হয়েছিল, বাবলুর মনে আছে। কারসাথে আনতে গিয়েছিল মনে নেই, তবে ডাক্তারের কণ্ঠস্বর মনে আছে। বলেছিলেন, ভয়ানক বিষাক্ত, সাবধানে রুগীকে দেবেন। বাবলু দেখল, মার একটি পা তলপেটের কাছে তোলা। মুখটা ঘোরানো। হাত দুটো বুকের কাছে ফটোর উপর। আতঙ্কের অত্যুগ্র শব্দে বাবলুর বুক ফুলে ফুলে উঠছিল। একটু এগিয়ে যায়। ডাক দেয়—মা। ঘরের আলো কুড়িয়ে নিল বাবলুর ডাক। বিড়ালটা লাফ দিয়ে খাটে উঠে। অপর্ণাদেবীর পায়ের কাছে ঘোরাফেরা করে।

বাবলু আবার চীৎকার করে ডাক দেয়—মা

উত্তর না পেয়ে প্রবলবেগে ছুটে গিয়ে প্রচণ্ড চীৎকারে মার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফটোটা সেসময় মাটিতে পড়ে টুকরো হলো আলো ছুটে আসে।

বাইরে তখন একটা রাস্তায় কুকুরের ভগ্নকণ্ঠ ডাক শুনে বিড়ালটা খাট থেকে লাফ দেয়। কয়েক দিন আগে বিড়ালটা মা হয়েছে। সেও কুকুরের ডাক শুনে এস্ত। বিড়াল সন্তানদের সামলাতে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়।

॥ দশ ॥

অবশেষে পাখীদের ঘুম ভাঙলো। সোনালী রোদ্দুর গায়ে মাখতে পুব দিকে পাখীরা শব্দ করে উড়ে চলল।

দরজায় আঘাত করে আলো। আবার করে। আবার এক থুথুড়ে বুড়ি দরজা খুলে দেয়। মুখে অজস্র বলি। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় চিনতে চেষ্টা করে। আলোর গায়ে হাত দেয়। বলে—কে মা তোমরা। ভেতরে এসো। কোথা থেকে এসেছো?

শ্মশান থেকে—আলো বুড়ির প্রশ্নের ছোট জবাব দিয়ে ভিতরে যায়, সাথে বাবলু। যে ঘরে শ্যামল থাকে প্রবেশ করে। ঘর অন্ধকার। সকাল সাতটায় এ ঘরে ভোর হয়। রোদ্দুর তারও পরে প্রবেশ করে।

শ্যামল—আলোর কণ্ঠে হাজার-বছরের উৎকণ্ঠা।

আবার ডাকে—শ্যামল।

ঘরে এক বিরাট নিস্তব্ধতা অন্ধকারে আটকে আছে, যেমন শ্মশানে, কোন কথা নেই, শুধু আগুণ জ্বলে, চেয়ে থাকে। বাবলু আলোর ঘনিষ্ঠ হয়। আলো আবার ডাকে—মঙ্গল।

থুথুড়ি বুড়ি এগিয়ে আসে।

গলা কাঁপিয়ে শব্দ উচ্চারণ করে—শ্যামলত নেই মা। গত কাল রাতে চলে গেছে। বললাম, আর একটু পাটা ভাল হোক, শুনল না। খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলে গেল। সাথে মঙ্গল গেছে। মালপত্তর নিয়ে কোথায় গেছে বলেও গেল না।

আলোর পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একটা শিহরণ খেলে গেল। যেন পৃথিবী কেঁপে উঠেছে। অন্ধকার ঘর থেকে আলো বাইরে এল। বারান্দায় একটি বাঁশের খুটি আঁকড়ে ধরে মাথা গুজে দিল বাঁশের গায়ে। বিড় বিড় করে বলে, শ্যামল শ্যামল। বাবলু বুঝুক বা না বুঝুক সে ভগ্ন কণ্ঠে বলে—ঘরে চল দিদি। নরেশ কাকা হয়তো হিন্দু সৎকার সমিতির অফিস থেকে ঘরে ফিরেছেন।

আজ আকাশ যেন পৃথিবীকে ঢেকে নেওয়ার জন্য নেমে আসছে। ক্রমশ নিচের দিকে নেমে আসছে। বিহ্বল পৃথিবী কেঁপে উঠছে। আর পৃথিবীর মানুষ আর্ত্তনাদ করে ঈশ্বর সমীপে বিনীত প্রার্থনা জানাচ্ছে—বিশ্বানি দেব সবিত দুরিতানি পরাসুব জোতির্ময়, আমাদের দুঃখ শোক তাপ পরাস্ত কর। এভাবে মার দিও না।

একদা আলোর ঈশ্বর পিতার কণ্ঠে চৌদ্দ বছরের আলো শুনত উপনিষদের এই জীবনভাষ্য!

হাজার হাজার বছর ধরে আকাশে বাতাসে আলোয় অন্ধকারে ঋষির কণ্ঠ উচ্চারিত হচ্ছে, জ্যোতির্ময় আমাদের দুঃখ শোক তাপ পরাস্ত কর। এই দুঃখ, এই শোক, তাই চিরকালের, চিরদিনের।

এই মুহূর্তে হাজার বছরের সেই কণ্ঠস্বর আলো যেন শুনতে পেল। ছোট ভাইয়ের হাত ধরে বললে—চল্।

শ্যামলের কথা নয়, মার কথা নয়, অন্যান্য কোন যুবকদের কথা নয়, তান্ত্রিকের কথা নয়, যাদব কাকার কথা নয়, এখন শুধু আলোর একান্তভাবে ওর স্বর্গীয় পিতার কথা মনে পড়ছে যে পিতা মায়ের কাছে ছিলেন হিংস্র শ্বাপদ এবং [illegible]কাছে ছিলেন ঈশ্বর।

ওরা ঘরে ফিরল।